কিশোর ভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা
পৌষ ১৩৭৬ • জানুয়ারী ১৯৭০

সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শ্রুভাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো অমূল্যনীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৬

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন

অমৃত

অমৃত সংবাদঃ "কিশোর ভারতী পত্রিকার আত্মপ্রকাশ থেকেই এর বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্র পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ গুণীজনের প্রশংসিত। আমরা এই পত্রিকাটির শুভকামনা করেছিলাম। মাত্র এক বছরেই কিশোর ভারতী কেবল কিশোরদের মধ্যেই শুধু নয়, সমস্ত শ্রেণীর পাঠকের সমাদর লাভ করেছে। **এবারের সুবৃহৎ শারদ সংকলনটি বৈচিত্র্যময় রচনা সমাবেশ, অঙ্গসজ্জা এবং মুদ্রণ পারিপাট্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠের দাবি করতে পারে।**........."

যুগান্তর ঃ ছোটদের পাততাড়ি

যুগান্তর (ছোটদের পাততাড়ি) ছোটদের পুজোর মজা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ "..........মজা কি একটা? পুজোটাই তো মজা। প্রতিমা দেখা আছে—আছে বাজনা গান, আকাশে বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ। নতুন জামা কাপড় জুতো আছে, যার যেমনটি মেলে, কারুর কারুর আছে বেড়াতে যাওয়া, কাছে কি দূরে। এ সবের সঙ্গে আরেকটা মজার কথাও ভোলবার নয়। ছোটদের জন্যে এই পুজোর সব লেখা। ছোটদের জন্যে সে হল আরেক আনন্দের হাট।......ফি বছর ছোটদের জন্যে এই পুজোর সময় কয়েকটি বার্ষিকী বার হয়।......**এবার ছোটদের আর একটি নতুন বন্ধু এসে বাজার মাৎ করেছে। ছোটদের সম্বৎসরের কাগজ যে একাধারে সার্কাস চিড়িয়াখানা মিউজিয়াম খেলার মাঠ যাত্রার কথকতার আসর আর সেই সঙ্গে দূর দূরান্তরের পাড়ি হওয়া উচিত, যুগান্তরের পাততাড়ির মত 'কিশোর ভারতী'তেও সেই কথা মনে রেখে মেলা সাজানো হয়েছে।** ছোটদের জন্যে লেখায় শুধু ভারে নয়—সত্যি যারা ধারে কাটেন এমন সব লিখিয়ে আর আঁকিয়ের সেখানে সমাবেশ হয়েছে।"

সাপ্তাহিক বসুমতী

সাপ্তাহিক বসুমতী-র মূল্যবান অভিমতঃ "একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়, **'কিশোর ভারতী' আবির্ভূত হয়েই শুধু বাংলাদেশই নয়, ভারত জয় করেছে। তার শারদীয়া সংখ্যাটি আরো অপূর্ব, আরো অসাধারণ। সারা ভারতে এতো ভালো কিশোর পত্রিকা আর নেই।** আমরা গত বছর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, যা নেই ভারতে, তা আছে কিশোর ভারতীতে। আমাদের কথা সত্যি কি না তা ছেলেরাই বলুক।......বাংলাদেশের ওই সেরা সংকলনে প্রায় একশ' সেরা লেখক আছেন—ছেলেদের বড়দের মন জয় করতে যাঁদের জুড়ি নেই।"

বিদ্যোদয়ের বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

এক জাহাজ গল্প

এক জাহাজ গল্প

প্রথম সংগ্রহ	**ময়ূরপঙ্খী**	[৬·০০]
দ্বিতীয় সংগ্রহ	**মকরমুখী**	[৬·০০]
তৃতীয় সংগ্রহ	**সাগরদাঁড়ী**	[যন্ত্রস্থ]

ছোটদের জন্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র একাই এক অপরূপ গল্পের মায়াপুরী গড়ে তুলেছেন। কি সেখানে নেই? পরীদের পাখার শব্দের মত স্বপ্নঝিমঝিম গল্প আছে, আছে ইতিহাসের ঝলমলে রঙিন গল্প, রক্তে দোলা লাগানো গল্প দুরন্ত দুঃসাহসের, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করা গল্প রহস্যের, আছে গায়ে কাঁটা দেওয়া ভয়ের গল্প, মজাদার কৌতুকের যেমন, তেমনি অতি মিষ্টি মন জুড়িয়ে দেওয়া গল্প আর আছে বিজ্ঞানের ভেলকি দিয়ে বানানো আশ্চর্য সব গল্প যাতে তাঁর জুড়ি নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই সব গল্প একত্রে সংগ্রহ করে এক জাহাজ গল্প সংকলনে প্রকাশ করা হল। কিশোরদের জন্যে তাঁর যাবতীয় গল্পের (ঘনাদার গল্পের নমুনা সহ) এ-ধরনের সংকলন এই সর্বপ্রথম।

ময়ূরপঙ্খী

প্রথমে আঠারোটি বিচিত্র স্বাদের গল্পের পণ্যে সমৃদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়েছে **ময়ূরপঙ্খী**। যশস্বী শিল্পী সূর্য রায়ের আঁকা ছোটয় বড়য় মিলিয়ে ছত্রিশখানি অপরূপ ছবি ও বহুবর্ণরঞ্জিত প্রচ্ছদপট **ময়ূরপঙ্খী**-কে সাজিয়েছে নয়নাভিরাম সাজে।

মকরমুখী

ময়ূরপঙ্খী-র পরেই সাজোসাজো রবে বার হয়েছে **মকরমুখী** সতেরটি নানান রসের গল্পের সওদায় বোঝাই হয়ে। যেমনি আশ্চর্যসুন্দর সব গল্প, তেমনি চোখ-জুড়োন এর ছবির বাহার আর প্রচ্ছদপটের বুঝি তুলনা নেই। এর ছবিগুলিও এঁকেছে সূর্য রায়। ছোটয় বড়য় এতে ছবির সংখ্যা চৌত্রিশ।

সবশেষে আসছে **সাগরদাঁড়ী**।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের আর কয়েকখানি বই

শুক্রে যারা গিয়েছিল [৩·০০] **ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস** [২·২৫] **গল্প আর গল্প** [২·২৫]

আরও কয়েকখানি বই

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র	৬·০০	সংকলন
সাইবিরিয়ার শেষ মানুষ	২·০০	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
স্বর্ণমুকুট	২ ৫০	গোপেন্দ্র বসু
আনন্দমঠ	২·০০	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দারুমূর্তির রহস্য	১·৬২	মণীন্দ্র দত্ত
সুন্দরবনের চিঠি	১·৬২	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯ * ফোন ৩৪-৩১৫৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী

প্রকাশন

চিত্রে ভারতের ইতিহাস
৪·৬২

ভারতীয় প্রদর্শনমালাসমূহের বিবরণপঞ্জী
২০·০০

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব ঃঃ **বাঙলার উৎসব**
২·০০ ১·২৫

খনার বচন
২·৫০

গান্ধী রচনাবলী

প্রথম খণ্ড
৫·০০

দ্বিতীয় খণ্ড
৫·০০

তৃতীয় খণ্ড
৯·০০

ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও মনি অর্ডার পাঠাইবার
—ঠিকানা—
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট প্রেস
পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ
৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭

নগদ বিক্রয় ঃ পাবলিকেশন সেলস্ অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট,
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-১

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) ১২৫।৭০

বিদ্যোদয়ের বই

ভয়ঙ্করের জীবন কথা
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহু অভিমতের একটি : "বিজ্ঞানের কাহিনী যে কত সরস ও রোমাঞ্চকর হয়ে উঠতে পারে তার পরিচয় পাই 'ভয়ংকরের জীবন কথায়'।...আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি, নামকরণের ইতিহাস আর পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত আগ্নেয়গিরির রোমাঞ্চকর বিস্ফোরণের কথা (লেখক) এত সহজ আর সুন্দরভাবে বলেছেন, যা সহজেই কিশোর-মনকে আকৃষ্ট করবে। **'ভয়ংকরের জীবন-কথা' ১৯৬২ সালে অষ্টম শিশু-সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছে। লেখকের কাছ থেকে আরও এই ধরনের বিজ্ঞান আশ্রিত কাহিনী পাবার আশা রাখি।"** [যুগান্তর] [মূল্য ২·২৫]

নাবিক রাজপুত্র ও সাগর রাজকন্যা
সঞ্জয় ভট্টাচার্য

অনেক অভিমতের একটি: "দুটি রূপকথা—নাবিক রাজপুত্র ও সাগর রাজকন্যা। দুটি গল্পই ঠিক আমাদের পুরনো রূপকথার ভংগীতে অথচ আধুনিককালের শিশুমনের উপযোগী ক'রে লেখা। ভাষা সুন্দর ও ঝরঝরে। অনেকগুলি ছবিতে ছোটদের মন ভরে উঠবে। ছাপা ও কাগজ ভাল। ছোটদের কাছে বইখানি আদৃত হবে বলেই বিশ্বাস।" [**যুগান্তর**] [মূল্য: ২·০০]

চোরের পাল্লায় চকরবরতি
শিবরাম চক্রবর্তী

'চোরের পাল্লায় চকরবরতি' শিবরাম চক্রবর্তীর এগারটি হাসির গল্পের সংকলন। শিবরামবাবুর লেখা সম্পর্কে বাংলা দেশের আবালবৃদ্ধ পাঠকের কাছে নূতন করে কিছু বলা বাহুল্য। তাঁর অন্যান্য পুস্তকের মতো এ পুস্তকের গল্পগুলিও পড়ে হাসতে হাসতে প্রাণান্তকর (!) অবস্থা দাঁড়ায়। [**মূল্য** ৩·০০]

আমার ভালুক শিকার
শিবরাম চক্রবর্তী

বহু অভিমতের একটি: "বাংলা সাহিত্যে শিব্রাম চকরবরতী এক এবং অদ্বিতীয়। যাঁর নামেই অতো হাসির ছটা, তাঁর রচনার প্রতিটি লাইন লাফিং গ্যাসে ঠাসা তো থাকবেই।...... প্রতিটি গল্প পড়ে হাসির দমকা হাওয়া ছাড়তে না ছাড়তেই এগিয়ে যেতে হয় পরবর্তী গল্পে। 'কাষ্ঠকাশির চিকিৎসা', 'মাতুলতা', 'আমার ভালুক শিকার' কিংবা 'ঘটোৎকচ বধ'—এক বাক্যে স্বীকার করতেই হবে অতি চমৎকার। বইখানার প্রচ্ছদপট ছোট বড় সবার ভাল লাগবে আর ঠিক তেমনি এর সুন্দর বাঁধাই আর ছাপা। [**রোশনাই**] [**মূল্য** ৩·০০]

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯ * ফোন ৩৪-৩১৫৭

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত। [২৬. ৬. ৬৯ তারিখের টি. বি. নং ১ দ্রষ্টব্য]

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক স্কুল লাইব্রেরীসমূহে ব্যবহারের জন্য ও প্রাইজ-পুস্তক হিসাবে সুপারিশকৃত। [২৫. ৯. ৬৯ তারিখের ২২/৬৯ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য]

'পত্র-ভারতী'র প্রকাশনায়

কিশোর ভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা
পৌষ ১৩৭৬/জানুয়ারী ১৯৭০

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

আমাদের কথা ৪৩৯

মামাবাবুর রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনীঃ ধারাবাহিক উপন্যাস

পাহাড়ের নাম করালী—প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪৬৬

হাসির গল্প

ঘুমের জন্য—নির্মলেন্দু গৌতম ৪৭০

বোম্বেটে কাহিনী

অ্যাডমিরাল কানোজী আংরে—অধীরকুমার রাহা ৪৪৭

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষতের সচিব শ্রদ্ধেয় ডঃ নির্মল সিংহের অভিমতঃ 'কিশোর ভারতী' শিশুদের জন্য একটা উৎকৃষ্ট পত্রিকা। এই পত্রিকার গল্প, নানা রকম রচনা, কবিতা শুধু শিশুদের নয়, বড়দেরও সাধ মেটাতে পারে। এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

নাটক

কর্মফল—তমাল চট্টোপাধ্যায় ৪৮১

মরু-গিরি-কান্তারে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঃ ধারাবাহিক উপন্যাস

দুরন্ত ঈগল—দীননাথ কাশ্যপ ৪৫২

বিশ্বসাহিত্যের সেরা গল্প

শেষের পাতাটি ঃ ও হেনরী—ভাবানুবাদ ঃ অরূপ ৪৭২

কবিতা ও লিমেরিক

নেতাজী—শান্তশীল দাশ ৪৫৮
শীত ঃ শীত—করুণাময় বসু ৪৫৮
নেই নেই—সরল দে ৪৫৮
বর্গীতলার মেলা—প্রীতিভূষণ চাকী ৪৫৮

লিমেরিক—পরিতোষকুমার চন্দ্র ৪৫৯
পদ্মা নদীর তীরে—অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৫৯
প্রভু খৃীষ্ট হে—শিশির মজুমদার ৪৫৯

গোয়েন্দা কাহিনী
একটি নেকলেসের জন্য—সুজাতা ভৌমিক ৪৪০

জীবজগতের কথা
অরণ্য-জীব যদি লুপ্ত হয়?—শৈল চক্রবর্তী ৪৬৩

সামাজিক গল্প
নন্দিনী—রবীন্দ্রকুমার বসু ৪৭৭

প্রাচীন সাহিত্যের গল্প
বিক্রমাদিত্যের গল্প—ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪৬০

শিকার কাহিনী
ভৌতিক বাঘ—শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৪৪৫

অতীতের পাতা থেকে
ইতিহাসের দিনলিপি—মহাকাল রায় ৪৮৫

রূপ-রঙ্গ
স্বপ্নলোকের চাবি—মনোরঞ্জন ঘোষ ৪৯৫

গ্রাহক-গ্রাহিকার আসর
সমব্যথী (গল্প)—ভক্তিপদ কর্মকার ৪৮৮
জাগো রে কিশোর দল (কবিতা)—জয়ন্তচন্দ্র সান্যাল ৪৮৯

বনের খবর (ছড়া)—সৈয়দ আহসান জমিল ৪৮৯
কয়েকটি হাস্যোজ্জ্বল মুহূর্ত (কাহিনী)—মানিকলাল দাশ ৪৯০

বিজ্ঞানীর দপ্তর
নিজে করো : রাসায়নিক বাগান—অমরনাথ রায় ৪৯৮

খোলামনের মেলাতে
সুজনবন্ধুর বৈঠক ৪৯১

ধাঁধা-হেঁয়ালি
ধাঁধা ৪৯৩
গত মাসের 'সাহিত্য-ধাঁধা'র উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ৪৯৪

খেলাধুলা
ক্তড়ত্রঘড থ
ব্যাটিং করার গোড়ার কথা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০০
খেলার জগতের বিচিত্র খবর—বিশ্বনাথ ৫০২

সওয়াল-জবাব
প্রশ্নোত্তর-বিভাগ—বাণী মৌলিক ৫০৩

বইয়ের দুনিয়া
পুস্তক-সমালোচনা—নিরাপদ রায় ৪৯৯

টুকরো হাসি
একটু হাসো!—রাম চট্টখণ্ডী ৪৪৪

টুকরো আবিষ্কার
পরিষ্কারক তরল পদার্থ—সুনীল সরকার ৪৬৯
চুল ছাঁটার যন্ত্র—সুনীল সরকার ৪৬৯

সংবাদ-বিচিত্রা
প্লাটিপাস—রথীন সরকার ৪৫১

ছবিতে অভিনব সরস কাহিনী
সর্বান্তঃকরণে—সূর্য রায় ৪৮৪
নন্টে আর ফন্টে—নারায়ণ দেবনাথ ৪৬২

ছবিতে হাস্যকৌতুকের ধারাবাহিক গল্প
ডমরু-চরিত—শৈল চক্রবর্তী ৪৪৬

প্রচ্ছদ
সুন্দরবন ও সমুদ্রে সন্ধ্যা নেমেছে—শিল্পী সূর্য রায়

প্রাপ্তিস্থান

কিশোর ভারতী কার্যালয় ॥ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ ॥ ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯
ডিএনবিএ ব্রাদার্স ॥ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯
এবং বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত **বইয়ের দোকান ও পত্রপত্রিকার স্টল**

মূল্য : পঁচাত্তর পয়সা

'পত্র-ভারতী'র পক্ষে দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

আমাদের কথা

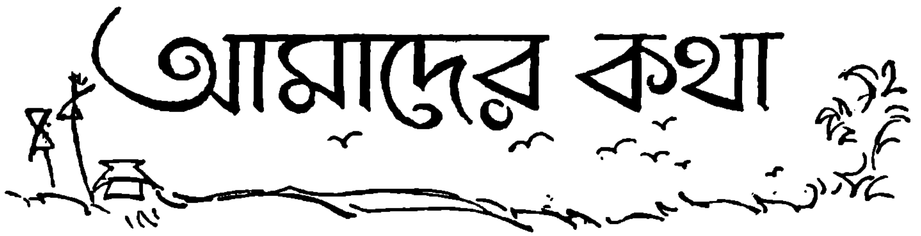

স্নেহের বন্ধুগণ,—পুরনো বছর ১৯৬৯ সাল বিদায় নিয়েছে। নতুন বছর ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের যাত্রা শুরু হলো। আমাদের জীবন থেকে শীতের ঝরা পাতার মতো আর একটা বছর খসে পড়লো। পৃথিবীর বয়স বেড়ে গেল আরো এক বছর।

আন্তর্জাতিক নববর্ষ ১৯৭০। আমাদের জন্য কি ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে তার গর্ভে? কেউই ঠিক বলতে পারে না। তবে পেছনে ফেলে আসা ১৯৬৯ সালের দিকে তাকিয়ে কতকটা আঁচ করা যায়। বুঝতে পারি, ধরিত্রীর বুকে তার অধিকাংশ সন্তানের গৃহসংসারে সহজে আসবে না সেই অনাবিল সুখ ও শান্তি যা মানুষ কামনা করেছে যুগ যুগ ধরে।

পেছনে তাকিয়ে কি দেখি আমরা? যা দেখি, তা মোটেই মনোরম নয়, বরঞ্চ ভয়ংকরই বলা যায়। দেখি, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের জয়যাত্রা চলেছে অসীমের দিকে আর তার পাশেই রোগশোক ও অভাব-অনটনের বিষে জর্জরিত পৃথিবী যুদ্ধবিগ্রহ আর বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের আগুনে জ্বলেছে গোটা বছর। আমাদের ভারতভূমিও তার বাইরে নয়।

তাহলে কি সামনে আমাদের নৈরাশ্যের কালো যবনিকাই শুধু, গহীন আঁধারে ঢাকা মানুষের ভবিষ্যৎ? না, তা নয়। অন্তহীন কাল থেকেই বয়ে চলেছে এই জীবনের স্রোত। দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে তার গতিবেগ। আরও উচ্ছল আরও প্রাণবন্ত হয়ে তা এগিয়ে যাবে সুখী ও সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে, তার চলার পথে বর্তমানের এই সংকট নতুন নয়। সভ্যতার এই সংকট দেখা গেছে অতীতেও—যুগে যুগে। মানুষের মধ্যে যারা অমানুষ, সেই মুষ্টিমেয় অত্যাচারী নৃশংস কংসের দল অতীতে মানুষের বিচিত্রসুন্দর বর্ণাঢ্য মিছিলের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, রক্তের স্রোতে সভ্যতার গতি ও কণ্ঠ রোধ করতে চেয়েছে বারে বারে। কিন্তু আজ তারা কোথায়? মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের প্রাণবন্যায় কোথায় অতীতের কোন্ আবর্জনা-স্তূপে তলিয়ে গেছে তারা। তেমনি যাবে বর্তমানেও—দুদিন আগে বা পরে। তাই, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হবার কারণ নেই।

কিন্তু সহজে কি আসবে সেই সুন্দর সোনালী ভবিষ্যৎ? না। তার জন্যে দরকার হবে আরো কত অশ্রু, রক্ত ও বলিদানের। তবেই তো ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে জন্ম নেবে সেই রক্তরাঙা সুখী সুন্দর জীবনপ্রভাত।

সুতরাং বুঝতে পারছো, সে প্রভাত আপনা থেকে আসবে না। তার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে তোমাদেরও। সেজন্য দেহে মনে, শিক্ষায় ও আদর্শে তৈরী হতে হবে তোমাদের।

তোমরা যারা স্কুলে পড়ো, তারা নিশ্চয়ই নতুন উদ্যমে পড়াশুনো শুরু করেছ, নতুন ক্লাশে উঠেছ সবাই। কেউ হয়তো দুর্ভাগ্যক্রমে উঠতে পার নি। কিন্তু তাতে হতাশ হলে চলবে না। আবার কোমর বেঁধে লাগো, নতুন উদ্যম ও কাজের মধ্য দিয়ে অর্জন করো সফলতা, তৈরি করো নিজেদের। আর যারা কলেজে পড়ো, তাদেরও বলি তৈরী হতে। ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হবার এই তো সময়।

এ মাস থেকে নতুন আর একটি বিভাগ খোলা হলো—'রূপ-রঙ্গ'। এই বিভাগটি ও অন্যান্য লেখা তোমাদের কেমন লাগলো জানাতে ভুলো না কিন্তু।

নববর্ষে তোমরা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহাশিস্ গ্রহণ করো। ইতি—

তোমাদের বন্ধু
সম্পাদক

একটি নেকলেসের জন্য

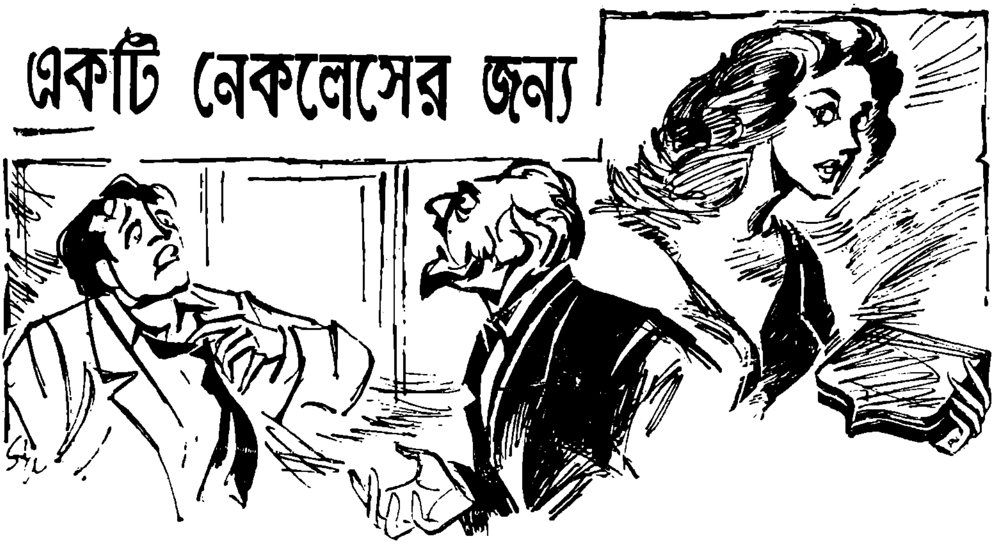

সুজাতা ভৌমিক

১৯৩৯ সালের কথা। স্থান প্যারিস। রু দ্য পে'র খ্যাতনামা জহুরী ফ্রাঙ্ক-এর দোকানের সামনে এক কালো রঙের বিরাট লিমুজিন গাড়ী এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে কেতাদুরস্ত পোশাক-পরা শ্যোফার ত্বরিতগতিতে আসন থেকে নেমে টুপি হাতে সসম্ভ্রমে দাঁড়াল পেছনের দরজা খুলে। তার হাবভাব, পোশাক দেখে সহজেই অনুমান হয় ধনী, অভিজাত পরিবারের কর্মচারী সে।

এর পর গাড়ী থেকে নামলেন এক অপরূপ সুন্দরী মহিলা। হালকা স্বচ্ছন্দ পায়ে তিনি গিয়ে ঢুকলেন দোকানে। সেখানে দোকানের মালিক দুজন কর্মচারী নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায় বসে আছেন। পাকা লোক এঁরা। এক ঝলক দেখেই ক্রেতার মনোভাব আর আর্থিক অবস্থা দুই-ই বুঝে নেন এবং অগ্রসর হন সেইভাবে।

আগন্তুক মহিলাকে দেখে এঁদের বুঝতে দেরী হল না, একটি ভালো শিকার হাতে এসেছে। দোকানের মালিক মিঃ ফ্রাঙ্ক, যাকে জহুরী জগতের রাজপুত্রই বলা যায়, তিনি নিজে এগিয়ে এলেন।

এক ঝলক মনোহারিণী হাসি হেসে মহিলাটি বললেন, 'আমার বান্ধবী দ্রু-শামবোর কাউন্টেস আপনাদের খদ্দের......'

জহুরী ভদ্রলোক মাথা নুইয়ে স্বীকৃতি জানালেন।

মহিলা বলে চললেন, 'ওঁর কাছে শুনলাম, আপনাদের দোকানের হীরের নেকলেসগুলি নাকি প্যারিসের সেরা। আপনাদের সংগ্রহগুলি একটু দেখতে চাই।'

ভদ্রলোক বিগলিত, সেই সঙ্গে আরও নত। এসব কায়দা-কানুনে তিনি অভ্যস্ত। বললেন, 'কাউন্টেস আমাদের খুব সম্মান করেছেন। তবে সবিনয়ে বলি, এ সম্মানের বোধহয় অনুপযুক্ত নই আমরা।'

তারপর চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, 'বসুন।'

এক আরামপ্রদ চেয়ারে মহিলাটি বসলেন। জহুরী তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর সংগ্রহ নিয়ে এলেন। কয়েকটি কালো কোমল মখমলের ট্রে,—তার ওপর অপূর্ব সব হীরে দ্যুতিতে ঝলমল করছে।

হীরের মতই যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল মহিলার সুন্দর চোখ দুটি। হালকা আঙুল ছুঁইয়ে আলতোভাবে তিনি নাড়াচাড়া করতে লাগলেন অমূল্য রত্নগুলি।

জহুরী মিঃ ফ্রাঙ্কের কিন্তু তখন লক্ষ্য গিয়ে পড়েছে তাঁর ক্রেতার দিকেই। উজ্জ্বল রং, কোমল, সংযত সৌন্দর্য, পাতলা আঙুল। সত্যিই সুন্দর। বলে দিতে হয় না এর আভিজাত্যকে। হীরের মালা গলায় দেবারই উপযুক্ত চেহারা। বয়স কী রকম হবে? আটাশ-ঊনত্রিশ! মহিলা বিবাহিত কিন্তু স্বামী কী করেন?

মহিলাদের দেখে তাঁদের স্বামীদের পেশা অনুমান করা মিঃ ফ্রাঙ্কের এক চিরদিনের খেয়াল। অবশ্য এ খেয়ালটি তাঁর ব্যবসায়িক কাজেই সহায়তা করে বেশী।

আর সত্যি বলতে কি বেশ নির্ভুল অনুমানই উনি করতে পারতেন। মিঃ ফ্রাঙ্ক তাই ভাবতে লাগলেন—কী পেশা মহিলার স্বামীর? ব্যাঙ্কার? শিল্পপতি? প্রশাসক? চিকিৎসক? মন্ত্রী?...........মনে হচ্ছে এ'র স্বামী কোন খ্যাতনামা চিকিৎসকই হবেন।

মহিলাটি একটি নেকলেস তাঁর কোমল হাতে তুলে নিলেন। মুহূর্তে যেন হাজার আলোর রোশনাই জ্বলে উঠল সেখানে।

'যদি কিছু মনে না করেন, এটা একটু পরে দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। খুব খুশী হব।'

মিঃ ফ্রাঙ্ক আয়নাটি এগিয়ে দিলেন। হীরের মালা পরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মহিলা নানাভাবে নিজেকে দেখতে লাগলেন। মিঃ ফ্রাংকও নিশ্চিন্ত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এ গহনা কেনার মত যথেষ্ট সম্বল মহিলার ব্যাগেই রয়েছে। রাস্তায় সামনেই তাঁর বিরাট গাড়ী ও শ্যোফারকেও দেখা যাচ্ছে।

মহিলা তাঁর গলা থেকে আস্তে আস্তে মালা খুলে ট্রের ওপর রাখলেন। বললেন, 'মালাটা খুব সুন্দর। দামও নিশ্চয়ই অনেক হবে।'

মিঃ ফ্রাঙ্ক শিকার বুঝে পা ফেলতে পারেন। বললেন, 'অবশ্যই দাম কিছু বেশী। কিন্তু জিনিসটি দেখুন। আপনাকে তো যা তা জিনিস তুলে দিতে পারি না।'

সুন্দরী তাঁর মিষ্টি হাসি দিয়ে কথাটি গ্রহণ করলেন। মন তিনিও প্রায় স্থির করে ফেলেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কত দাম?'

'আজ্ঞে, কুড়ি মিলিয়ন।......বিশ্বাস করুন, একটুও বাড়িয়ে বলছি না, এ মালা আপনার গলাতেই শোভা পায়।'

মহিলা ঈষৎ মুখ নীচু করলেন। ঈষৎ রক্তাভা যেন ছড়িয়ে পড়ল তাঁর মুখে।

'মিঃ ফ্রাংক, এটা আমি নেব স্থির করেছি, কিন্তু একবার আমার স্বামীকে দেখিয়ে তাঁর মতটা নিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। তিনি...........'

'আমি মাদাম কার্তো-ব্র'তো।'

মিঃ ফ্রাংক মনে মনে হাসলেন। তাঁর অনুমান ঠিক। অধ্যাপক কার্তো-ব্র'তো একাডেমী অব মেডিসিনের সদস্য, কে না চেনে ওঁকে?

'বলুন, কি করা যায়? উনি কি একবার আসতে পারবেন?'

'বোধহয় না। উনি তাঁর গবেষণা, মিটিং আর কাজ নিয়ে সারাদিনই এত ব্যস্ত থাকেন.........বুঝতেই পারেন। আমার মনে হয়, আপনি আমার বাড়ীতে আসুন। যদি অসুবিধা না হয়, কাল আসবেন? তাহলে আমার স্বামীকে বলে রাখব।'

মিঃ ফ্রাঙ্ক তাঁর কার্ড এগিয়ে দিলেনঃ 'এই আমার টেলিফোন নম্বর। যখন সুবিধে হয়, আমাকে খবর দেবেন।'

জহুরী তাঁর সুন্দরী ক্রেতাকে গাড়ী পর্যন্ত পেঁাছে দিলেন। শ্যোফার এগিয়ে এল, কিন্তু তিনি নিজে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরলেন। হাজার হোক, কুড়ি মিলিয়নের ক্রেতা তো!

শহরের ১৬নং মহল্লায় অধ্যাপক কার্তো-ব্র'তোর চেম্বার। কালো রঙের একটা বড় লিমুজিন এসে দাঁড়ালো সে বাড়ীর গাড়ীবারান্দায়। দু মিনিট পরে দেখা গেল আরোহিণী অধ্যাপকের সাক্ষাৎপ্রার্থী এবং অধ্যাপকের অফিস-কক্ষে তিনি অপেক্ষা করছেন।

পেছনে, নিজের ঘরে অধ্যাপক সযত্নে কিছু কাগজ-পত্র গোছাচ্ছেন। সেক্রেটারি এসে কার্ড দিয়ে গেল তাঁকে, কার্ডে লেখা মাদাম লুসি ফ্রাঙ্ক। বিখ্যাত জহুরী আঁদ্রে ফ্রাঙ্ককে অধ্যাপক জানতেন। একবার একটা গহনাও কিনেছিলেন কয়েক বছর আগে ওঁর দোকান থেকে—এক আত্মীয়কে উপহার দেবার জন্য।

মাদাম ফ্রাঙ্ক ঘরে ঢুকতেই অধ্যাপক তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

'এ'কে কোথায় যেন দেখেছি।'—মনে হল অধ্যাপকের, —'হবেও বা, কত জায়গাতেই তো যাই!'

সুন্দরী আরক্তিম হলেন। বললেন, 'আপনার সংগে দেখা করতে এসেছি, কিন্তু আমার অবস্থাটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।'

এ ধরনের কথায় অধ্যাপক খুব যে অবাক হলেন তা নয়। কেন না, অনেকেই এ রকম প্রথমে বলেন, সংকোচ প্রকাশ করেন, পরে আস্তে আস্তে তা কেটে যায়। উনি মৃদু হেসে মাদাম ফ্রাঙ্ককে অভয় দিলেন, 'ঠিক আছে, আপনি আমায় সব কথা বলতে পারেন।'

'না, এটা ঠিক আমার ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা আমার স্বামীর।'

'মিঃ ফ্রাঙ্ক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আর ঠিক অবস্থাটা বোঝানো এত মুস্কিল—'

গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যাপক তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

'আমার স্বামী অসুস্থ, কিন্তু তিনি সেকথা স্বীকার করেন না।' বিব্রত গলায় মহিলা বললেন।

'তাঁকে এখানে নিয়ে আসা উচিত ছিল আপনার। আমি তাঁকে পরীক্ষা করতাম। অবশ্য আমার মনে হয়, যতটা ভয় পাচ্ছেন, ব্যাপারটা তত কিছু নয়।'

মহিলা মাথা নাড়লেনঃ 'শুনুন, আমার স্বামী আঁদ্রে ফ্রাংক জহুরী। এঁর ব্যবসায়িক খ্যাতির কথা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নেই। পুরুষানুক্রমে এঁদের এ ব্যবসা। উনি এ ব্যবসা খুবই পছন্দ করেন, আর পরিশ্রমও করতে হয় খুব। এত টাকা খাটছে, ভাবনা চিন্তা থাকাটা স্বাভাবিক—'

'তা তো বটেই।'

'এত দিন উনি সুস্থই ছিলেন। গত ছুটিতে আমরা নীসে ছিলাম, তখনও উনি হাসিখুশী মিশুকে, স্বাভাবিক। কিন্তু প্যারিসে ফিরে আসার পরই..

বিচলিত মহিলা একটু থেমে আবার বলে চললেন, 'ফিরে আসার পরই ওঁর কি রকম মনমরা ভাব লক্ষ্য করছি।......মনে হচ্ছে, উনি যেন আর সে মানুষ নন —ভাল করে খান না, কোথাও বেরোতে চান না, রোগা হয়ে যাচ্ছেন,......কি বলব ডাক্তারবাবু, আমার এত চিন্তা হচ্ছে।'

স্পষ্টতঃই ভদ্রমহিলাকে অত্যন্ত বিচলিত বোধ হল। অধ্যাপক তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আপনি বেশী উদ্বিগ্ন হবেন না। আচ্ছা, উনি কি পছন্দ করছেন? ঠিকমত কাজ করছেন তো?'

'কাজ নিয়েই বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। আগে কখনও বাইরে বা বন্ধুবান্ধবের কাছে কাজের কথা তেমন তুলতেন না। আর এখন ও ছাড়া গীত নেই। পরিচিত কাউকে দেখলেই এগিয়ে গিয়ে গহনার কথা বলবেন, কিছু কেনবার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন,—যেন সবাই ওঁর খদ্দের।'

অধ্যাপক একবার চশমা খুলে মুছে নিলেন, একটু বুঝি চিন্তিতঃ 'তাই তো'—'

'প্রথম প্রথম বন্ধুরা এটাকে ঠাট্টা মনে করত, হাসাহাসি করত, এখন আর তা নেই। এই তো সেদিনই উনি এক বাল্যবন্ধুকে তার স্ত্রীর জন্য এক ছড়া হার গছিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের একটুও ইচ্ছে ছিল না। দুই বন্ধুতে এ নিয়ে বেশ মন কষাকষি হয়ে গিয়েছে।'

ডাক্তার বললেন, 'এরকম হয়।'

'হয়ত হয়। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি আর পারছি না। ওঁর শরীর দিন দিন এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে—আর কিছুদিন এরকম চললে হয়ত উনি পাগলই হয়ে যাবেন!'

উদ্গত অশ্রু সংবরণ করতে মহিলা রুমালে চোখ মুছলেন।

'আহা, আপনি বড্ড বেশী ভয় পাচ্ছেন। আমি তো বলেছি, এ সামান্য মানসিক অবসাদ মাত্র। উনি ভাল হয়ে যাবেন। তবে আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে বলুন।'

একটু সামলে নিয়ে মহিলা বললেন, 'হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন, আসবেন। আমি.........আমিও ওঁর সঙ্গে থাকতে চাই। উনি তো আমাকে সঙ্গে আনবেন না। তাই উনি যখন আসবেন, তার আগে আমি এখানে উপস্থিত থাকতে চাই। প্রথমে হয়ত উনি আমাকে এখানে দেখে অবাক হয়ে যাবেন, তবে মনে মনে খুশীই হবেন। পরে আপনি ওঁর সঙ্গে আলাদা কথা বলবেন।'

'বেশ আপনি আগে আসবেন—আমার সহকারীকে তা বলে রাখব।'

'ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু, তাহলে কালকে—'

'কাল বিকেল ৫টার সময়।'

'আচ্ছা ধন্যবাদ।'

উঠে মহিলাকে এগিয়ে দিতে অধ্যাপকের মনে হল, ইনিও অল্পবিস্তর পাগল। আর আধুনিক মহিলাদের তো হামেশাই এসব হচ্ছে।

'হ্যালো মিঃ ফ্রাঙ্ক!'

'হ্যাঁ, কথা বলছি—'

'আমি মাদাম কার্তো-ব্রঁতো বলছি—'

'নমস্কার। বলুন, বলুন!'

'আমি আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছি। উনি কাল বিকেল পাঁচটার সময় আপনাকে আসতে বললেন।'

'কাল পাঁচটা? বেশ। আমি কি নেকলেসটা......'

'হ্যাঁ, মিঃ ফ্রাঙ্ক, আপনার নেকলেসটা নিয়ে আসবেন।' তারপর একটু হেসে মহিলা যোগ করলেন, 'আমার স্বামী ওটা আমাকে উপহার দিতে চান।'

'নিশ্চয়ই আমি ওটা নিয়ে যাব।'

পরের দিন বিকেলে সেই কালো লিমুজিনটা অধ্যাপক কার্তো-ব্রঁতোর চেম্বারের গাড়ী বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সেই সুন্দরী মাদাম কার্তো-ব্রঁতো ওরফে মাদাম

ফ্রাঙ্ক গাড়ী থেকে নেমে এলেন। ডাক্তার ব্র'তোর সহকারী তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসালেন।

'আমার স্বামীও আসবেন।'—মহিলা বললেন।

'আমি জানি, উনি এলেই আমি ওঁকে এখানে নিয়ে আসব। আপনারা ছাড়া আর কেউ এ ঘরে থাকবে না।'

'ধন্যবাদ।'

একটা বড় গদিওয়ালা চেয়ারে ভদ্রমহিলা একটা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় মনোনিবেশ করলেন। একটু পরেই বোঝা গেল, সহকারীটি মিঃ ফ্রাঙ্ককে নিয়ে আসছেন। মুহূর্তের জন্য যেন মহিলা একটু বিবর্ণ হলেন। হাতের আঙুলগুলো থরথরিয়ে উঠল। দরজাটা খুলতেই উনি পত্রিকার আড়ালে মুখ রাখলেন, যেন বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন।

স্বল্প কাশির আওয়াজে তিনি বুঝলেন, ভদ্রলোক একেবারে কাছে এসেছেন। তিনি মাথা তুললেন। ভদ্রতা আর সৌজন্যে বিগলিত মিঃ ফ্রাঙ্ক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। সহকারী চলে গিয়েছেন।

'মিঃ ফ্রাঙ্ক,—'

'আমি বুঝতে পেরেছি আপনি এখানে। আপনার গাড়ী বাইরে দেখলাম।'

গদিতে হেলান দিয়ে খুশী-খুশী মুখে মহিলা বললেন, 'কি সৌভাগ্য! আমার স্বামী আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। নেকলেসটা এনেছেন তো?'

মিঃ ফ্রাঙ্ক পকেট থেকে একটা গহনার বাক্স বের করলেন। আলতোভাবে বাক্সটা খুলে গেল।

'এই যে—'

শিশুর মত আনন্দে উচ্ছ্বল মহিলা গহনাটা নিয়ে গলায় পরে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'মিঃ ফ্রাঙ্ক, আমার মাথায় একটা ফন্দী এসেছে। সান্ধ্য পোশাকের ওপর এই গহনাটা পরে আজ যদি আমার স্বামীর কাছে যাই, বলুন তো, কেমন হবে? এক সেকেন্ড, আমি আসছি।' বলেই তিনি দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললেন।

মিঃ ফ্রাঙ্ক হাসলেন। মেয়েদের ব্যাপার বোঝা দায়!

চেম্বারে বসে অধ্যাপক ঘড়ি দেখলেন, পাঁচটা। সহকারীকে ডাকলেনঃ 'মিঃ ফ্রাঙ্ক?'

'উনি অপেক্ষা করছেন।'

'আর তাঁর স্ত্রী?'

'এসেছিলেন, আবার এক্ষুণি বেরিয়ে গেলেন।'

'বেশ, মিঃ ফ্রাঙ্ককে আসতে বলুন।'

মিঃ ফ্রাঙ্কের প্রবেশ। অধ্যাপক তাঁকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'আসুন মিঃ ফ্রাঙ্ক, ব্যাপার কি?'

মিঃ ফ্রাঙ্কের কয়েক মুহূর্ত বাক্‌স্ফূর্তি হল না। তিনি তো এ রকম অভ্যর্থনা আশা করেন নি। একটু অপ্রস্তুতভাবে আস্তে আস্তে বললেন, 'ভালোই আছি, খবর সব ভালোই।'

অধ্যাপক ভদ্রলোককে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছেনঃ কাল্পনিক অসুস্থতা। এ রোগীকে তিনি ভাল করে তুলতে পারবেন। ভদ্রলোকের টাকা পয়সা তো যথেষ্ট, ব্যবসায়ে নামডাকও আছে—আর অমন সুন্দরী স্ত্রী! নাঃ, কেসটি বেশ মজার হবে।

'আমি আপনাকে জানি, মিঃ ফ্রাঙ্ক। কিছুদিন আগে আপনার দোকান থেকে একটা গহনা কিনেছিলাম।'

মিঃ ফ্রাঙ্ক দাঁত বের করে হাসলেন ঃ হ্যাঁ, আর আজকে একটা খাঁটি গহনা আপনার জন্য এনেছি।'

ডাক্তারবাবু টেবিলের উপর একটু ঝুঁকে বসলেনঃ ভদ্রমহিলা ঠিকই বলেছেন। জিনিস বিক্রির রোগ ওঁর মাথায় চেপেছে। অদ্ভুত খেয়াল!

'অ্যাঁ, আপনি আমার জন্য গহনা এনেছেন?'

'ঠিক আপনার নয়, আসলে মাদাম কার্তো-ব্র'তোর—'

'মাদাম কার্তো-ব্র'তো?'

'অপূর্ব! উনি তো মুগ্ধ। বিশ মিলিয়ন মূল্যের গহনা.........'

'বিশ মিলিয়ন দাম, তাই অপূর্ব?'

'আজ্ঞে আপনার স্ত্রীরই উপযুক্ত।'

'সন্দেহ নেই। কিন্তু.........'

নাঃ! আমি যত সহজ ভেবেছিলাম, তা তো নয়। মাথার গন্ডগোল ভালই পাকিয়েছে। ভদ্রমহিলা মিথ্যে বলেন নি। এঁর শক্ ট্রিটমেন্ট দরকার হবে।—ডাক্তার ভাবলেন।

'মিঃ ফ্রাঙ্ক, অনুরোধ করে লাভ নেই। আমার স্ত্রী আপনার এ বহুমূল্য অপূর্ব অলঙ্কার কিনতে পারছেন না। কারণ অতি সহজ—'

'কি?' মিঃ ফ্রাঙ্ক শুকনো মুখে প্রশ্ন করলেন।

'কারণ আমার স্ত্রী নেই, আমি অবিবাহিত।'

'কিন্তু উনি যে কাল আমার দোকানে গিয়েছিলেন ....এই একটু আগেই এখানে ছিলেন......পোশাক বদলাতে গেলেন.....বেল্ দিন, ডাকুন তাঁকে...... সে কি!......' বিব্রত উত্তেজিত মিঃ ফ্রাঙ্ক বলে চলেছেন।

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, 'আপনাকে তাহলে খুলে বলি। উনি আমার স্ত্রী নন। আপনার স্ত্রীই আপনাকে অভ্যর্থনা করেছেন।'

'অ্যাঁ! আমার স্ত্রী?' মিঃ ফ্রাঙ্ক হতাশায় ভেঙে পড়লেন, তাঁর গলা বিকৃত হল, শরীর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলঃ 'শুনুন ডাক্তারবাবু, আমি পাগল নই—'

বিপদের কথা। রুগী এড়িয়ে যেতে চাইছে। ডাক্তারবাবু একটু ম্লান হাসি হাসলেন।

মিঃ ফ্রাঙ্ক যেন এ সময় ডাক্তারবাবুর মনের কথা বুঝতে পারলেন। সন্দেহ হল তাঁর। তিনি অবসাদ ঝেড়ে ফেলে জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'না, আমি পাগল নই। আমি আপনাকে যা বলছি, ঠিকই বলছি। কিন্তু.........'

চোখ বিস্ফারিত করে হঠাৎ টেবিলে এক ঘুষি মেরে তিনি বললেন, 'আমারও তো স্ত্রী নেই, ডাক্তারবাবু! আপনার মত আমিও অবিবাহিত।'

দুজনের চোখাচোখি হল—ঠিক যেন বক্সিং রিং-এ দুই খেলোয়াড়।

'আশ্চর্য!' অধ্যাপক বললেন।

'কিন্তু এ কী করে হয়? আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে।'

'উত্তেজিত হবেন না।' ডাক্তার বেল টিপে সহকারীকে ডাকলেন, 'আচ্ছা বলুন তো, ও ঘরে যে ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, উনি কি নামে পরিচয় দিয়েছেন?'

'আজ্ঞে, মাদাম ফ্রাঙ্ক।'

'শুনুন, মিঃ ফ্রাঙ্ক।'

মিঃ ফ্রাঙ্ক হতাশায় ককিয়ে উঠলেন, 'দেখুন, ঐ মহিলাকে এখানে আসতে বলবেন?'

'আজ্ঞে, উনি তো চলে গিয়েছেন।'

মিঃ ফ্রাঙ্ক এটিকেট ভুলে গিয়ে তাঁর টাই খুলে ফেললেন ঃ 'একেবারে চলে গিয়েছেন?'

'আজ্ঞে।'

ব্যাপারটা এখন আর কারও কাছেই অস্পষ্ট রইল না,—মহিলাটি দুজনকেই ঘোল খাইয়েছেন।

মিঃ ফ্রাঙ্ক রাগে ফেটে পড়লেন, 'আপনি এত বড় ডাক্তার, মনস্তত্ত্ববিদ্! আপনাকেও একটি স্ত্রীলোক শিশুর মত ভুলিয়ে গেল?

'তা বটে। তবে আমার তো কুড়ি মিলিয়ন দন্ড গেল না!'

টাকার শোকে ভদ্রলোকের রাগ হল দ্বিগুণ। তিনি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গেলেন ঃ 'কে জানে, আপনি এ যোগসাজসে আছেন কিনা! আপনার চেম্বারে এ রকম একটা ব্যাপার ঘটল। আপনার সহকারী কোর্টে দাঁড়িয়ে কি বলতে পারবেন, তিনি মাদাম ফ্রাংককে চেনেন, অথচ আমি বিয়েই করিনি?......কিন্তু এসব তো হল পরের কথা ডাক্তারবাবু, আমার যে কুড়ি মিলিয়ন দন্ড গেল!'

ডাক্তারবাবু বিবর্ণ হলেন, কিছুটা উত্তেজিতও। সত্যি তো, কি কান্ড! এ নিয়ে যদি কোর্ট-পুলিস হয়, লোকে জানবে। তাঁর সহকর্মীরা—অ্যাকাডেমীতে—সবাই কি ভাববে? এ কি বিপদে পড়া গেল!

অবশ্য জল আর বেশীদূর গড়ায় নি। দুজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। কাজেই খবরের কাগজ কিছুটা করুণাবশতঃই এ নিয়ে আর হৈ চৈ করল না—পুলিসও চুপিচুপি কাজ সারল।

এর বহু দিন পর মার্সেল সিকো নামে এক পুলিস কর্মচারী তাঁর এক লেখায় এ কাহিনীর উল্লেখ করে বিস্তর হাসির খোরাক জুগিয়েছিলেন।

সুন্দরী মহিলাটির কিন্তু আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। নেকলেসটিরও না।

টুকরো হাসি—একটু হাসো!

—রাম চট্টখুণ্ডী

শিক্ষক—হ্যাঁরে ক্যাব্‌লা পরীক্ষার খাতায় মাত্র একটি প্রশ্নের অর্ধেকটা উত্তর লিখে সমস্ত ফাঁকা খাতাটা জমা দিয়েছিস্! এর কারণ কী?

ক্যাব্‌লা—স্যার, আপনিই তো আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন—"বি শোর্ট বাট্ শিওর।"

ভৌতিক বাঘ

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ডুয়ার্স্ অঞ্চলের একটা বাঘ ভাতমারি ও আশেপাশের গ্রামের লোকদের আতংকগ্রস্ত করে তুলেছে। বাঘ এসে মানুষ নিয়ে যায়, তার নিশানা আছে; কিন্তু কোন দিকে নিয়ে গেল, তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। দুটি মাস ধরে বাঘের উৎপাত চলছে। এই দুই মাসের মধ্যে বাঘ মানুষ মেরেছে ষোল জন, গরু নিয়েছে দশটি। বাঘ মারতে এসে তিনজন শিকারী নিখোঁজ হয়েছেন।

এবার আমার পালা। সরকার বাহাদুর বাঘ মারতে আমাকে পাঠালেন। আমি যখন ভাতমারিতে এসে পৌঁছলাম, তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। চারদিকেই ঘন বন। তার মাঝে রেলওয়ে কলোনী। সে প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা বলছি।

আমি স্টেশন মাস্টারের বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছি। আমাকে দেখে তিনি খুশী হয়েছেন বলে মনে হলো না। রাত্রে খাবার টেবিলে বসে তিনি বললেন, আপনার শিকারে আসা উচিত হয় নি, সত্যেনবাবু।

বললুম, কেন বলুন তো?

তিনি বললেন, বাঘ শিকার করা সোজা। কিন্তু এ তো বাঘ নয়—ভৌতিক বাঘ! শুনুন, আমাদের ক্যাশিয়ারবাবুর কোয়ার্টার উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। রাত্রে স্বামীর জন্য ভাত আনতে গিয়ে বউ আর ফিরলো না। ব্যাপার কি দেখতে গিয়ে ক্যাশিয়ারবাবু দেখেন, রান্না ঘরের আশেপাশে বাঘের পায়ের ছাপ। কিন্তু তারপর বউকে নিয়ে বাঘ কোন্ দিকে গেল তার নিশানা নেই। গত পরশু আমাদের কুলী রামদীন গিয়েছিল হাটে, সে আর ফিরলো না। মালপত্রের সামনে বাঘের পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল, সে বাঘের কবলে পড়েছে। কিন্তু বাঘ তাকে নিয়ে কোন্ দিকে গেল, ধরা গেল না।

এরকম আরো দু একটা কাহিনী তিনি বললেন।

আমি চুপ করে শুনলাম, কোন উচ্চবাচ্য করলাম না। কারণ বাঘ সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েই আমি এসেছি। কাজেই স্টেশন মাস্টার মশাইয়ের কথা শুনে আশ্চর্য হলাম না।

ভোর হতেই চা-টা খেয়ে বের হয়ে পড়লাম। এদিক ওদিক ঘুরে খবরাখবর নিয়ে দুপুরে বাড়ি ফিরে এলাম। সকলের মুখে এক কথা—এ ভৌতিক বাঘ! মানুষ ধরার চিহ্ন পাওয়া যায়, কিন্তু নিয়ে যাবার কোন নিশানা পাওয়া যায় না। বাড়ি এসে স্টেশন মাস্টারকে বললাম, আমি বিকেলেই খেয়েদেয়ে শিকারে যাবো। কাল সকালে সাতটা আটটার মধ্যে যদি ফিরে না আসি, তখন আমার খোঁজ নিতে চেষ্টা করবেন। ,

স্টেশন মাস্টার আমার কথা শুনে শিউরে উঠে

বললেন, একা যাবেন নাকি? না না, ও কাজ করবেন না! লোকজন নিয়ে যান।

আমি বললাম, আমার ইচ্ছা আমি একাই যাবো। লোকজন নিয়ে গেলে বাঘ সজাগ হবে। আমি চাই না বাঘ সতর্ক হোক।

বিকেলে কিছু খাবার, টর্চ ও রাইফেল নিয়ে রওনা হলাম। পাড়ার লোকেরা সকলেই আমাকে বাধা দিলেন। আমি কিন্তু কারো বাধা শুনলাম না। একাকী বনের ভিতর প্রবেশ করলাম।

সারা বিকালটা একা একা ঘুরে বেড়ালাম। কাকস্য পরিবেদনা। বাঘ তো দূরের কথা, একটা শিয়ালও চোখে পড়লো না। হতাশ হয়ে পড়লাম। এদিকে অন্ধকারও নেমে এলো। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুরু হলো।

ঘুরতে ঘুরতে একটা মরা খালের কাছে এসে পড়লাম। মরা হলেও খালে একটু একটু জল ছিল। সন্ধ্যার সময় বনের জীবজন্তুরা জল খেতে আসে। এমন সময় নীচে থাকা ঠিক নয়। কখন কোন্ দিক দিয়ে কি ঘটে যাবে বলা শক্ত। একটা উঁচু গাছ দেখে উঠে বসলাম।

সারা রাত গাছে কাটলো। দূরে শিয়াল ডেকে ডেকে চলে গেল। হিংস্র প্রাণীরও আওয়াজ পেলাম। কিন্তু আমি যে জায়গায় আছি সেখানে কেউ এলো না। সারা রাত বসে বসে মশার কামড় খেলাম, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না।

দেখতে দেখতে ভোর হলো। শুরু হলো পাখিদের কলরব। ঠান্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগলো। স্থির করলাম আর একটু ফরসা হলেই গাছ থেকে নেমে বাড়ি যাব।

বসে বসে ভাবছি—এখানে বাঘের উৎপাতে মানুষ ঘরের বাইরে যেতে পারছে না। অথচ আমার চোখে একটাও জানোয়ার পড়ল না। আশ্চর্য! বাড়ি গিয়ে পাড়ার লোকদের কি বলবো?

বিরক্ত হয়ে নামতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ খালের ওপারে ঝোপের ধারে দৃষ্টি পড়লো। চোখ ফেরাতে পারলাম নাঃ দুটি বাঘের বাচ্চা খেলা করছে!

আর নামা হলো না। বাচ্চা যখন আছে, বাঘিনীও নিশ্চয় আছে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। ভৌতিক বাঘের রহস্য বের হয়ে পড়লো এবার। সবই ঐ বাঘিনীর কাজ, আর কারও নয়। বাঘিনীর অপেক্ষায় চুপ করে বসে রইলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বাঘিনীর দেখা পেলাম। একটা বাছুর মুখে করে হেলতে দুলতে আসছে। আর লেজ দিয়ে পায়ের দাগগুলো মুছে দিচ্ছে।

তখন বেশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। দেখলাম ঝোপের কাছে প্রচুর হাড়গোড় ও মানুষের মাথা। বাঘিনী বাছুরটাকে এনে ঝোপের কাছে রাখল। বাচ্চা দুটো মাকে দেখে ছুটে এলো। বাছুরটার চোখ মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল। বাচ্চা দুটো এসে জিব দিয়ে চাটতে লাগলো। বাঘিনী বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে বাছুরটাকে রেখে এদিক ওদিক তাকালো। তারপর খালে নেমে চক্‌চক্ করে জল খেতে লাগলো।

বাঘিনী আমার গাছ থেকে মাত্র চল্লিশ গজ দূরে। বাঘিনী জল খেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বোধ হয় কিছু দেখছে। এই তো সুযোগ। আমি দেরী না করে তার কপাল লক্ষ্য করে রাইফেল চালালাম। 'গুড়ুম' করে শব্দ হলো। গুলি খেয়ে বাঘ সেখানেই পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে আবার যেই উঠতে যাবে, আমার আর এক গুলিতেই লুটিয়ে পড়ল, আর উঠলো না।

স্টেশন মাস্টার আমার দেরী দেখে, লোকজন নিয়ে খুঁজতে বের হয়েছেন। তাঁর ধারণা আমাকেও পাওয়া যাবে না। গুলির শব্দ শুনে তিনি দলবল নিয়ে ছুটে এলেন। আমি তখন গাছ থেকে নেমে এসে বাঘিনীকে পরীক্ষা করছি। এমন সময় স্টেশন মাস্টার এলেন।

তাঁকে বললাম, এই আপনাদের ভৌতিক বাঘ। বাঘিনীর বাচ্চা হয়েছে—ঐ দেখুন। বাচ্চা হলে বাঘিনী বাচ্চাগুলোকে ভয়ে লুকিয়ে রাখে, যাতে অন্য বাঘে টের না পায়। আর শিকার করে নিয়ে আসবার সময় সে পায়ের দাগ মুছে দেয়, আপনাদের ভয়ে নয়, ঐ বাঘেরই ভয়ে। বাঘ যদি ছাপ দেখে এসে পড়ে, সেজন্য।

আমার কথা শুনে সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, তাই নাকি? সে কথা তো আমরা জানতাম না।

সেই থেকে বাঘের উৎপাত বন্ধ হয়ে গেল।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ডমরু-চরিত অবলম্বনে • শিল্পী : শৈল চক্রবর্তী

॥ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ॥

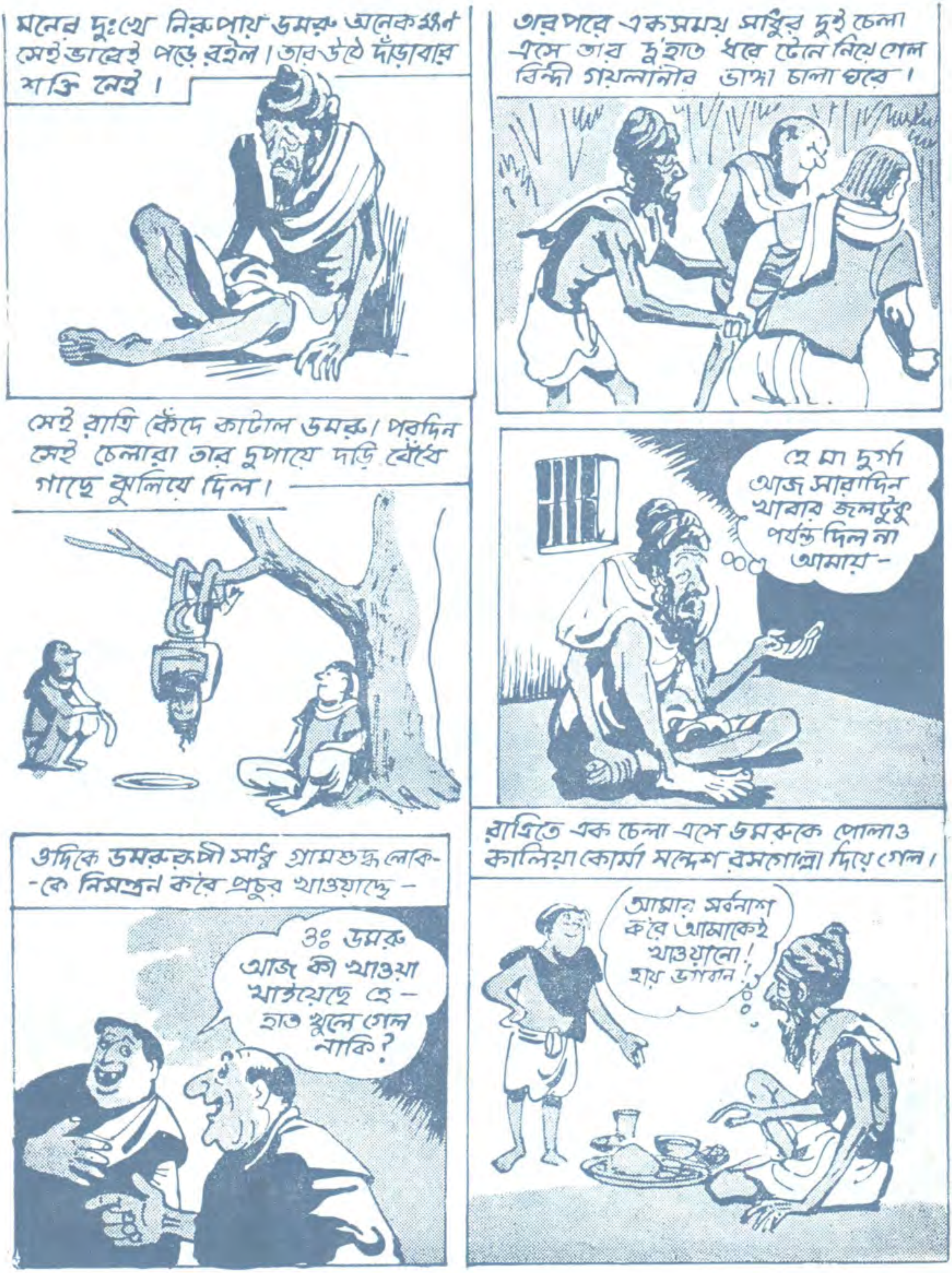

ডমরুর কানে আসে-প্রতিদিনই নাকি ঐ সাধু ধূমধাম ক'রে লোকজন খাওয়ায় এবং বন্ধুদের নিয়ে ফিস্ট চালায়।
ডমরুবাবু যে মহাসমারোহে বিয়ে করতে যাচ্ছেন!
ডমরুর প্রাণ ফেটে যেতে লাগল। হায় হায়.. শেষে কিনা ঐ বেটা সাধু তারই মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করবে! অসহ্য জ্বালায় ডমরু সাধুর দেহ থেকে বেরিয়ে পড়ল।
বাঃ! পৃথিবীকে আবার আমি দু'চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি - অথচ আমার এই দেহ কোনো মানুষ দেখতে পাবে না!
ও... এরা সব বাজনাওয়ালা। বসে আছে -
বরের জন্যে চার ঘোড়ার গাড়িও প্রস্তুত দেখছি!

[চলবে]

অ্যাডমিরাল কানোজী আংরে

অধীরকুমার রাহা

গোবর্ধন দাস ঝানু ব্যবসায়ী। কঙ্কন থেকে সুরাটে ও বোম্বাইয়ে নিত্য যাতায়াত করে তার জাহাজ জন কোম্পানীর নিশান উড়িয়ে। গোবর্ধন দাসের বাস বোম্বাইতে। জন কোম্পানীর প্রজা। জাহাজে তাই কোম্পানীর নিশান। কানোজীর দস্তক এড়াবার এই হল সহজ উপায়।

সেদিন তার জাহাজ 'সাকসেস্' চলেছে বোম্বাইতে। তাতে দামী সেগুন কাঠ বোঝাই।

শান্ত, স্থির আরব সমুদ্র। হঠাৎ ক্যাপ্টেন লক্ষ্য করেন এগিয়ে আসছে একখানি ঘুরাব। মাস্তুলে পত পত উড়ছে জরির পতাকা।

ঘুরাবের সঙ্গে পনেরো-কুড়িখানি গাল্লিবত। আরবী টাট্টুর মত প্রকান্ড মারাঠা যুদ্ধ-জাহাজটার আগে আগে ছুটে আসছে ঢেউয়ের তালে তালে।

গাল্লিবতগুলির ডেকে ডেকে মারাঠা সৈন্য। বড় বড় শিঙায় বাজখাঁই আওয়াজ উঠছে। টমটম আর ঢক্কার গুম গুম আওয়াজ। ঢাল তলোয়ার বর্শা বর্মে সজ্জিত মারাঠা সৈন্য। জাহাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরী। 'সাকসেস'-এর দিকে এগিয়ে আসছে সেই জন্যই। কেন আসছে, তাও জানেন ক্যাপ্টেন।

মারাঠা ঘুরাবের ছটি কামান তাক করা সাকসেস্-এর দিকে।

দস্তক! দস্তক আছে মারাঠা সারখেল কানোজী আংরের!—ঘুরাব থেকে ভেসে আসে তীক্ষ্ম পরুষ কণ্ঠ।

এ কোম্পানীর জাহাজ। দেখছ না নিশান? —উত্তেজনা চেপে হেঁকে ওঠেন ক্যাপ্টেন।—চুক্তি অনুযায়ী দস্তক নিতে বাধ্য নই।

ঘুরাবে গাল্লিবতে ক্ষণিকের দ্বিধা। তারপরই ভেসে আসে কানোজীর জরির পতাকা ওড়ানো জাহাজ থেকে নাখোদার (ক্যাপ্টেনের) কণ্ঠস্বরঃ জাহাজ থামাও। আমার সিপাইরা তল্লাশ করবে জাহাজ।

গাল্লিবতগুলি সাকসেস্-এর গায়ে এসে ঠেকে। বাধ দিতে বারণ করেন ক্যাপ্টেন। হাতাহাতি যুদ্ধে মারাঠা সৈন্যের সঙ্গে পারবে না কেউ। আর ঘেরাও যখন হয়েছেন কানোজীর নৌবহরের হাতে, প্রতিরোধের চেষ্টাও বৃথা।

কাগজপত্র থেকে বোঝা গেল জাহাজখানা কার

দামী সেগুন কাঠ বোঝাই জাহাজ আটক করল কানোজীর নাখোদা।

চুক্তি আছে, শুধু কোম্পানীর জাহাজই বিনা দস্তকে চলাফেরা করবে। তা বলে কি কোম্পানীর প্রজাও?

খবরটা গেল বম্বের গভর্নর বুনের কাছে।

ভীষণ চটে গেলেন তিনি। মারাঠা বোম্বেটেটার আস্পর্ধা ত কম নয়। আটক করতে আসে কোম্পানীর নিশান ওড়ানো জাহাজ!

শিক্ষা দিতে হবে বোম্বেটেটাকে। এমন শিক্ষা যা সে জীবনে ভুলবে না। একেবারে ধ্বংস করে ফেলবেন ওর নৌবহর।

সংকল্প ত করলেন বুন। কিন্তু কাজটা কি অতই সোজা?

বম্বে থেকে কঙ্কন, সারা উপকূল ধরে ছড়ানো কানোজীর নৌঘাঁটি। সাগরগড়, দেওগড়, সুবর্ণদুর্গ, লৌহগড়, ঘেরিয়া, কান্দেরী, কোলাবা।

ছোট ছোট দ্বীপ-দুর্গে ছড়ানো ওর জাহাজ। মারাঠা সৈন্যের মতই সম্মুখ যুদ্ধে নামে না। একলা পেলেই কোথা থেকে ছুটে আসে ঘুরাব আর গাল্লিবতের ঝাঁক—যার সামনে দাঁড়াতে পারে না ভারি ভারি কামান-ধারী ইংরেজ জাহাজও।

কি করে এই শয়তান জলদস্যুকে শায়েস্তা করা যাবে?

বুদ্ধি দেবার লোকের অভাব হয় না।

ম্যানুয়েল ডি ক্যাসট্রো নামে একজন পর্তুগীজ গোলন্দাজকে চাকরিতে নিয়েছিলেন কানোজী নিজের নৌ-সেনাকে শিক্ষা দিতে।

লোকটা ছিল দুশ্চরিত্র। দুর্নীতিপরায়ণ। বিশ্বাস-ঘাতক। স্বরূপ বুঝতে পেরেই কানোজী তাকে বরখাস্ত করেন। সে অমনি ভিড়ল বুনের দলে। জানিয়ে দিল কানোজীর বাহিনীর গোপন সব খবর।

চুপি চুপি জানাল সে ঃ হিজ একস্লেন্সি! বর্ষার সময় বেহাল বোম্বেটেটা। ঘুরাব, গাল্লিবত, শিবর, মাণ্ডোয়া—ছোট বড় সব জাহাজ, ধোয়া মোছা করে তুলে রাখে ঘেরিয়ার ঘাঁটির ডাঙগায়। নারকেল পাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে সব জাহাজ। ওখানে আগুন ধরিয়ে দিতে পারলেই ধ্বংস হবে আংরের নৌবহর!

ঘেরিয়া আক্রমণের দিনটাও সে বাতলে দিল। শীগগিরই বিয়ে কানোজীর মেয়ে লাড়ুবাইয়ের। কোলা-বার বাড়ীতে ব্যস্ত থাকবেন কানোজী। বিয়ের দিনই আগুন ধরানোর জাহাজ নিয়ে যেতে হবে ঘেরিয়ায়।

মোঘলরা কোনদিনই মাথা ঘামায়নি নৌশক্তি নিয়ে। স্থলযুদ্ধে তারা অজেয়—এই গর্ব নিয়েই মেতে ছিল। মেনে নিয়েছিল পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ নৌবহরের আধিপত্য। নৌবাহিনী গড়ে ভারতরাজ মারাঠা রাজা-রামের নামে কানোজীই প্রথম পশ্চিম উপকূলে প্রতিষ্ঠিত করলেন ভারতবাসীর সার্বভৌমত্ব। দাবী করতে লাগলেন রাজশুল্ক।

ব্যাপারটা ভাল লাগেনি জন কোম্পানীর। এত দিন তারা বিনা শুল্কেই উপকূল বাণিজ্য করে এসেছে। আজ দস্তক দেবে কেন? তারা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, কানোজীর দস্তক চাইবার কোন অধিকার নেই। সে ত একজন জলদস্যু! এমন ভাবে জুলুম করলে ইংরেজের হাতে তাকে শায়েস্তা হতে হবে।

বম্বের ইংরাজ মহলে যখন প্রচার হল বুনের মাস্টার প্লান—কানোজীর নৌবাহিনী সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা, তখন উল্লাসের বান ডাকল। উদগ্রীব আগ্রহে তাঁরা চেয়ে রইলেন ঘেরিয়া অভিযানের দিকে।

কোলাবায় কানোজীর ঘরে চলেছে যখন বিয়ের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বুনের জাহাজগুলি তখন সংগোপনে এগিয়ে চলেছে ঘেরিয়ায়। সঙ্গে আগুন ধরানোর সরঞ্জাম।

কানোজীর শক্তি সামর্থ্য ভুল বুঝেছিলেন বুন। ঘেরিয়ার কাছে গিয়ে দেখেন বড় বড় পালের খুঁটিতে বন্দরের মুখ বন্ধ। জাহাজ নিয়ে যাবার উপায় নেই নৌবহরে আগুন লাগাতে।

ফিরে যাচ্ছিলেন ঘেরিয়ার দ্বীপ-দুর্গের পাশ দিয়ে। অবাক হয়ে দেখলেন, যাবার সময় যে দুর্গ ছিল নীরব নিঝুম, ফেরবার সময় হঠাৎ তা যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে।

দুম! দুম! দুম!

আকাশের বজ্র ভেঙ্গে পড়তে থাকে বুনের নৌ-বহরের উপর। ধ্বংস, জখম, আগুনের মহোৎসব নৌবহরের মাঝে!

হতচকিত নৌবহর ছত্রভঙ্গ। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে বম্বের দিকে।

পরাজয়। চরম ব্যর্থতা। বম্বের দেশী বিদেশী সদাগরদের মাঝে মুখ দেখানোর উপায় নেই। তবু দমলেন না বুন।

আবার তোড়জোড় চলতে লাগল লড়াইয়ের। এবার আর একা নয়। দলে টানার চেষ্টা করলেন গোয়ার

পর্তুগীজ গভর্নরকে। কিন্তু ধূর্ত ইংরেজের হয়ে লড়বার কোন গরজ দেখা গেল না তার। অতএব একাই লড়বেন, স্থির করলেন বুন।

কানোজীও চুপ করে বসে নেই। ঘেরিয়াতে অতর্কিত আক্রমণ করে বুন তাঁকে বেশ বিপদে ফেলেছিলেন। নেহাত বুদ্ধি করে বন্দরের মুখে পুঁতে রেখেছিলেন শালবলী, যার কথা জানত না বিশ্বাসঘাতক ক্যাসট্রো—তাই বাঁচোয়া।

এমন অপ্রস্তুত আর হবেন না ভবিষ্যতের যুদ্ধে।

বম্বে, সুরাটে ছড়িয়ে দিলেন তিনি চর। কোম্পানীর উঁচু মহলে ঘোরাফেরা করে তারা খবর সংগ্রহ করতে লাগল।

বম্বের নামকরা শাহুকর রামকামাথী। ইংরাজের সঙ্গে ব্যবসা করে অনেক টাকা কামিয়েছেন। কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি বেচেননি ইংরাজের কাছে। তিনি বুঝেছিলেন ইংরাজ বুনের মতলব। বুন গ্রাস করতে চায় পুরো দেশটা। তাই দরকার তাঁর মারাঠা সারখেল (অ্যাডমিরাল) কানোজীর মত পথের কাঁটা।

তাঁর কাছ থেকেই কানোজীর চর খবর পেল। ঘেরিয়ার পর কান্দেরী।

বুন ক্ষমা করেননি পরে রামকামাথীকে। বাংলার মহারাজ নন্দকুমারের মত ইংরেজ তাঁকেও ফাঁসি দিয়েছিল অমনি জাল দলিল তৈরি করে!

কান্দেরী, যকৃতের আকারের ছোট্ট দ্বীপ। লম্বা এক মাইল, চওড়া আধ মাইল। বম্বে থেকে দূরত্ব দশ মাইল। বম্বের কাছে কানোজীর যে মূল ঘাঁটি কোলাবা, সেখান থেকেও দূরত্ব ১০ মাইল। পাথুরে এই দ্বীপটির উপর নৌঘাঁটি তৈরি করেছিলেন কানোজী নিজেই। পূবের অর্ধবৃত্তাকার অংশে থাকত জাহাজগুলি।

কানোজীর যুদ্ধরীতি তৈরী হয়ে গিয়েছিল সুবর্ণ দুর্গে সিদ্দির নৌ-অবরোধে। দুর্গের অধিষ্ঠাতা কূর্ম-দেবতাই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এই রণনীতির। শত্রুকে তিনি টেনে আনেন নিজের কাছে। তারপর মোকাবিলা তার সঙ্গে!

কান্দেরী থেকে একে একে সরে যেতে থাকে জাহাজগুলি। ঘুরাব গাল্লিবত। রয়ে যায় কখানা ছোট জাহাজ মাঞ্চোয়া।

দুর্গের মধ্যে নিঃশব্দে চলে আয়োজন। গভর্নর বুন তার খবর রাখেন না। জানেনও না, শক্তির উৎস কোথায় মারাঠা জলদস্যুর। সম্মুখ সমরে লড়বার জন্য জমায়েত করতে থাকেন তিনি নৌবহর।

আরব সমুদ্রের উপর সূর্য সেদিন তখনও দেখা দেয় নি। ভোরে উঠে দুর্গাধিপ মানিকজী সূর্যবংশী দেখলেন কুড়ি পঁচিশখানা ইংরাজ জাহাজ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে ছোট্ট দ্বীপটিকে।

আক্রমণ আসবে তা জানতেন মানিকজী। কিন্তু তা যে এমন বিরাট আকারে আসবে তা ভাবতেও পারেন নি। কুড়ি পঁচিশখানা জাহাজে রয়েছে অন্তত দু হাজার ইংরাজ সৈন্য। দুর্গে মাত্র চারটি বড় কামান। মেয়ে পুরুষে তিনশ জন।

ইংরাজ অভিযান শুরু করলে, কি করতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া ছিল কানোজীর। মানিকজী সেই অনুসারে কাজ শুরু করলেন।

তিনখানা মাঞ্চোয়া ভোরের আঁধারে বেরিয়ে গেল কান্দেরী থেকে। কোলাবায় খবর দিতে হবে আর যোগাড় করে আনতে হবে অস্ত্রশস্ত্র।

ইংরাজ নৌবহরের চোখ এড়ায় না। ধাওয়া করে মাঞ্চোয়া তিনখানার পিছনে। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই থামতে হল। কোলাবার দিক থেকে আসছে কয়েকখানা ঘুরাব। সঙ্গে অনেকগুলি গাল্লিবত।

আংরের জাহাজ কি আসছে লড়াই করতে? পিছু-ধাওয়া ছেড়ে অপেক্ষা করতে থাকে ইংরাজ জাহাজগুলি।

মূল্যবান খবর নিয়ে মাঞ্চোয়া তিনখানা বেরিয়ে যায়। আংরের জাহাজগুলিও অদৃশ্য!

কি মতলব আংরের? সরাসরি লড়বে না? শুরু হল কামান থেকে গোলাবর্ষণ। তিন চারদিন সমানে গোলাবর্ষণে দুর্গ-প্রাচীরের খানিকটা ভাঙল। দুর্গ থেকে পালটা গোলাবর্ষণের কোনও লক্ষণ নেই।

দুর্গরক্ষীরা নিষ্ক্রিয় কেন? অবাক হন বুন। গোলাবারুদের অভাব? দুর্গের আরও কাছে সরিয়ে নিলেন জাহাজ।

দ্বীপে সৈন্য নামিয়ে দুর্গ আক্রমণ না করলে এ শত্রুকে যুদ্ধে নামান যাবে না। জাহাজগুলি দু ভাগে ভাগ হয়ে পূব আর পশ্চিম দিক থেকে সৈন্য নামাবে। আগে নামবে দেশী সেপাই। তারপর ইংরাজ সৈন্য।

দেশী সিপাইরা বেঁকে বসে। তারা আগে নামতে রাজী নয়। নামবে আগে ইংরাজ সৈন্য। এইসব বীর-পুরুষের হিম্মত জানে তারা। বেকায়দা দেখলে ওরা দুশমনের সামনে তাদের এগিয়ে দিয়ে সরে পড়বে!

বুন তর্জনগর্জন করলেন। শাসালেন। শাস্তি দিলেন। শেষে টাকা কবুল করলেন, এক এক সেপাই

পাবে একশ টাকা। আর মারা গেলে, কোম্পানী তাদের পরিবারের ভার নেবে।

এতেও বিশেষ ফল হল না। শেষে পূব দিকে শুধু ইংরাজ সেনার ছোট এক দল নামানো স্থির হল।

দড়ির মই নিয়ে এগিয়ে চলে দলটা। দুর্গ প্রাচীরের কাছে এসে তোড়জোড় চলে মই লাগানোর। সেকালে দুর্গ আক্রমণের এ ছিল একটা কৌশল।

অকস্মাৎ যেন ঘুমন্ত দুর্গ জেগে ওঠে। প্রাচীরের অদৃশ্য ফোকর থেকে দুম দুম মাস্কেটের আওয়াজ। ছুটে আসে শিলাবৃষ্টির মত অজস্র পাথর।

কুড়িজন সৈন্য মারা পড়ল। বাহান্নজন মারাত্মক ভাবে জখম। মাস্কেটের অবিরাম গুলি ও প্রস্তর বৃষ্টির মাঝে মই বেয়ে দেওয়াল টপকায় কার সাধ্য? দুর্গের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা বৃথা। ছত্রভঙ্গ দলটা ছুটে পালায় তীরে বাঁধা নৌকাগুলির দিকে।

পরের দিন সকালে তিন দল সেনা নামানো স্থির করেন গভর্নর বুন।

আরব সাগরও সেদিন বুঝি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল দস্যুতার ঘৃণ্য আক্রমণে। সকাল থেকেই প্রবল তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে কান্দেরীর পাহাড়তটে। তীক্ষ্ণ বাতাস। তীরের মত বেঁধে।

সকাল দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল বাতাসের বেগ কমবার জন্য।

প্রথমে নামবেন মেজর শ্যানটনের নেতৃত্বে একটা দল। তারপর ক্যাপ্টেন কক্সব্রীজ ও গিডিয়ান রাসেলের নেতৃত্বে দুটি দল।

তীরের দিকে নৌকোগুলি এগিয়ে আসে। তীর থেকে শুরু হয় গোলাবর্ষণ। কয়েকখানি নৌকো ডোবে। কয়েকটি দল তীরে পেঁছায়।

এবার আর মই বেয়ে দুর্গে প্রবেশ নয়। দলকে দল সৈন্য এসেছে। দুর্গের তোরণ ভেঙে ঢুকবে দুর্গে।

গোপন খবর পেয়েছেন বুন,—দুর্গে সৈন্যসংখ্যা খুবই কম। তোরণ ভেঙে দুর্গে ঢুকতে পারলেই দখল হবে দুর্গ।

গিডিয়ান রাসেলের দলটা এগিয়ে যায় ফাটকের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্য পথে অজস্র ধারায় ছুটে আসে পাথরের ঝাঁক। আহত হলেন গিডিয়ান রাসেল।

এর পর এল কক্সব্রীজের বাহিনী। কুঠার দিয়ে কাঠের দরজা কুপিয়ে কেটে ঢুকবে ভিতরে। ঠক ঠক ঠক। তালা দেওয়া সিং দরজায় পড়তে থাকে কুঠারের আঘাতের পর আঘাত।

উপর থেকে অমনি শুরু হয় ইটপাথরের ধারাবর্ষণ। তার মাঝে স্থির হয়ে কুঠার চালাবে কে? কাছে আসতেই জখম হচ্ছে একের পর এক ইংরাজ সেনা।

এত ইট, এত পাথর অবিরাম ধারায় অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুড়ছে কারা?

ইটপাথরের মাঝে মাঝে তীরের ঝাঁক। মাস্কেটের গুলি।

একজন ক্যাপ্টেন তো পাগল হয়ে গেলেন। তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিজের দলের লোকজনের উপর।

দুর্গ-তোরণের বন্ধ দরজায় মস্তবড় তালা ঝুলছে। ওটা পিস্তলের এক গুলিতে উড়িয়ে দেওয়া যায় না? গুলি ছুড়লেন একজন ক্যাপ্টেন। সে গুলি ফিরে এসে উড়িয়ে দিল তার নিজেরই নাক!

কক্সব্রীজের দল পিছু হটল। এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল মেজর শ্যানটনের দল। দরজা ভাঙ্গার চেষ্টায় উন্মাদ তারাও মুহুর্মুহু ঘায়েল হতে লাগল ইটপাথর, বর্শা ও মাস্কেটের ঘায়ে।

দুর্গের মধ্যে কত লোক? কত মাস্কেট? কারা এমন অবিরাম প্রবাহে ছুড়ে চলেছে ইট, পাথর, বর্শার ঝাঁক, মাস্কেটের অগ্নিঝলক?

জাহাজ খালি করে আরও সৈন্য পাঠালেন বুন।

কান্দেরীর দুর্গের সুউচ্চ চূড়া থেকে তখনই সংকেত চলে যায়। দূরে, বহু দূরে অপেক্ষা করছে যে ঘুরাব গাল্লিবতের বাহিনী, দ্রুতগতিতে তারা এগিয়ে আসতে থাকে সৈন্যহীন ইংরাজ জাহাজগুলির দিকে।

শ্যানটনের দলেরও সমান দুর্গতি। অবিশ্রান্ত জখম হচ্ছে সৈন্য। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা।

এমন সময় হঠাৎ—

হর হর মহাদেব! আরব সাগরের মাঝ থেকে সহসা ভেসে আসে মারাঠার রণকোলাহল।

চমকে ওঠেন মেজর শ্যানটন। মারাঠা সেনার যুদ্ধধ্বনি! দুর্গ থেকে কি মারাঠা সৈন্য বেরিয়েছে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতে?

না, কোথাও দেখা নেই মারাঠা সৈন্যের।

আবার শোনা যায়ঃ হর হর মহাদেব!

দূরে সমুদ্রের বুকে কয়েকখানা জাহাজ জ্বলছে। মারাঠা গাল্লিবত থেকে সৈন্য এসে জ্বালিয়ে দিয়েছে সারি সারি ইংরাজ জাহাজ। যেমন দ্রুত তারা এসেছে, তেমনি দ্রুত পালিয়েছে।

সমুদ্র থেকে বুন ব্যাকুল সংকেত পাঠাতে থাকেনঃ ফিরে এস শীগ্‌গির।

গিডিয়ান রাসেলের দলটাকে রেখে মেজর শ্যানটন নিজের দল নিয়ে ছুটলেন নৌকোয় উঠতে।

শত্রু ফিরে যাচ্ছে! দুর্গ প্রাকার হতে ধ্বনিত হয় তূর্যনিনাদঃ হর হর মহাদেব!

গিডিয়ান রাসেল, মেজর শ্যানটন সচকিত হয়ে তাকান দুর্গপ্রাচীরের দিকে। অগণিত নারী দুর্গ প্রাচীরের অলিন্দে অলিন্দে অবিরাম বয়ে আনছে প্রস্তর-খন্ড। বিষাক্ত শাণিত তীরের ঝাঁক ও মারাঠা বীরদের আয়ুধভার যোগাতে তারা ব্যস্ত।

শত্রু পালাচ্ছে! বন্ধ কর পথ! মাস্কেটধারী সৈন্য নিয়ে দুর্গ থেকে এবার বেরিয়ে আসেন মানিকজী সূর্য বংশী।

মেজর শ্যানটনের দলের কিছু লোক নৌকোয় উঠতে পেরেছিল। গিডিয়ান রাসেলের দল সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হল!

সারি সারি জাহাজ জ্বলছে। ওদিক দিয়ে ভাল জাহাজগুলি নিয়ে সরে আসবার পথ বন্ধ। দুর্গের কাছ ঘেঁষে পশ্চিম দিকের জাহাজগুলির সঙ্গে মিলতে যান বুন।

অমনি দুর্গ থেকে ছুটে আসে আগুনের গোলা। জাহাজের পর জাহাজ জখম হয়। ডোবে অর্ধেক।

মারাঠা গাল্লিবতগুলি তখন যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে আরব সাগরের মাঝে! লড়াই করবেন বুন কার সঙ্গে? আর লড়াই করার ক্ষমতাও ছিল না তাঁর। মাত্র কয়েক-খানা জাহাজ নিয়ে হতমান বুন তাই ফিরে গেলেন বম্বেতে।

আবারও ব্যর্থ হল তাঁর মারাঠা বোম্বেটেকে শায়েস্তা করার অভিযান!

প্লাটিপাস

রথীন সরকার

কত অদ্ভুত ধরনের জীবজন্তুই না এই পৃথিবীতে আছে! তোমরা সেই সব জীবজন্তুর স্বভাব, জীবনযাত্রা গতিবিধির কথা শুনলে খুবই আশ্চর্য হয়ে যাবে।

চিড়িয়াখানায় নিশ্চয়ই তোমরা সবাই গিয়েছ। সেখানে কত বিচিত্র ধরনের জীবজন্তুই না দেখেছ। কিন্তু এগুলিই শেষ নয়। এর বাইরে এখনও বহু জীবজন্তু রয়েছে যাদের আমরা আজও জানতে পারি নি। মানুষ তাদের সন্ধান পায় নি। তেমনি এক অদ্ভুত জন্তুর কথা আজ তোমাদের শোনাব। এদের নাম প্লাটিপাস। ভারতবর্ষের মতো বিরাট অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে এদের বাস।

আকৃতিতে এরা খুব একটা বড় নয়। আমাদের দেশের কুকুর শেয়ালের মতো। কিন্তু এরা দৈহিক বৈশিষ্ট্যে ও স্বভাবে আমাদের দেশের কোন জন্তু জানোয়ারের মতোই নয়। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে এই বিশেষ জন্তুটিকে কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। এরা সরীসৃপ নয়, জন্তু জানোয়ার এমনকি পাখীও নয়। অথচ এদের স্বভাবে বা দৈহিক গঠনে ত্রিবিধ প্রাণীরই সমন্বয় রয়েছে। এরা কুকুরের চেয়ে কিছু বড়। চারটি পা ও একটি নাতিদীর্ঘ লেজ রয়েছে। এদের ঠোঁটটি ঠিক হাঁসের মতো চেপ্টা।

পাখীরা ডিম পাড়ে তোমরা সবাই জান। এবং সেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। কিন্তু তারা কি মানুষের মতো দুধ খায়? খায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই প্লাটিপাস জন্তুটি পাখীর মতো ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে তারা মায়ের দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করে।

শুধু তাই নয়। সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে চলে না বটে কিন্তু এদের ধর্ম অনেকটা সরীসৃপের মতো। আত্মরক্ষা অথবা অক্রমণ করবার জন্যে এদের বিষনখ আছে এবং সেটা পায়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারে। প্রয়োজনে সেই বিষনখ বের করে এরা আক্রমণ করে এমনকি শিকারও ধরে থাকে।

পৃথিবীর আর কোন মহাদেশে এই অদ্ভুত জন্তুটিকে দেখা যায় না। প্রাণী বিজ্ঞানীদের মতে একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া ও জলবায়ুই এদের জীবন ধারণের পক্ষে উপযুক্ত। বর্তমানে এই প্রাণীটির জীবনযাত্রা সম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে। এবং পৃথিবীর অন্য কোন মহাদেশে এদের অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

দুরন্ত ঈগল

দীননাথ কাশ্যপ

ধারাবাহিক উপন্যাস

॥ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ॥

প্রথম খন্ড ॥ প্রথম পর্ব

॥ সাত ॥

হিমানী-সম্প্রপাত নেমে আসছে। তার ভয়াল গর্জন কানে যেতেই, তাগাই যে ইয়াকের পিঠে বসে ছিল, সেটা তীব্র আওয়াজ ছেড়ে আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলো। কুকুরটা ছিটকে পড়ে গেল তাগাইয়ের হাত থেকে।

পরক্ষণে তুষারের বিপুল ধস ওপর থেকে প্রচন্ড বেগে ভেঙে পড়লো তাগাইয়ের ওপর। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে তাগাইয়ের দেরী হয় নি। ধস থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোটের নীচেটা সে টেনে তুললো মাথার ওপর। আর তার ফলে ইয়াকের মাথার ওপর ও তার মুখের সামনে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হলো। দম আটকে মরার হাত থেকে তারা রক্ষা পেল—অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে।

তুষারের চাপে ইয়াকটা ছটফট করছে। বিন্দু-মাত্র অসতর্ক নড়াচড়া হলেই মাথার ওপরের তুষারের ছাদ ধসে পড়তে পারে, তাহলে দম আটকে মরতে হবে তাদের। দেরী হলেও মৃত্যু অনিবার্য। ফাঁকা জায়গা-টুকুতে যে বাতাস আছে, সামানাই তার পরিমাণ।

তাগাই অভিজ্ঞ ভাগ্যান্বেষী—দুঃসাহসী জাঁহাবাজ মুসাফির। সম্পদের লোভে দেশে দেশে সে অভিযান করেছে। ঘুরেছে প্রায় গোটা চীনদেশ। গেছে জাপানে, ভারতবর্ষে। মৃত্যুর মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হয়েছে একাধিকবার। মৃত্যুকে সে দেখেছে রাইফেলের নলের মুখে, তার সরাসরি পাল্লার মধ্যে, দেখেছে গলায় বাঁধা ফাঁসির দড়িতে, দেখেছে ইয়াংসি নদীর ভয়ঙ্কর আলিঙ্গনে। এবার সে মৃত্যু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রচন্ড তুষার-ধসের রূপ নিয়ে।

দু হাত দিয়ে তাগাই মাথার ওপরের তুষারের ছাদ ঠেকিয়ে রেখেছে। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে হাত দুটো সে একটু নামিয়ে আনলে। প্রতি মুহূর্তে ভয়, ছাদ না ধসে পড়ে। এবার সাবধানে সে উপরের তুষার খুঁড়তে শুরু করে আর পা দিয়ে মাড়াতে থাকে নীচের তুষার।

একটু পরে বিরাট তুষারের ঢিবির তলা থেকে প্রথমে বেরিয়ে এল ছোরাসমেত তার একখানা হাত, তারপর মাথা। যতদূর চোখ যায়, শুধু তুষারের সাদা আস্তরণ। তার নজর পড়ে কুকুরটার ওপর। তারপরেই কানে এল পার্টিজানদের কণ্ঠস্বর। সে চকিতে গা ঢাকা দিল।

অত্যন্ত পাতলা সুউচ্চ পর্বত-এলাকার বাতাস। পার্টিজানরা তার মৃত্যু সম্বন্ধে যে আলোচনা করছে, তার প্রতিটি কথা তাগাই স্পষ্ট শুনতে পায়। সে ঘাপটি মেরে থাকে। তারপর ওরা চলে যেতেই সে বেরিয়ে এল হামাগুড়ি দিয়ে। খোলা বাতাসের গন্ধ পেয়ে ইয়াকটাও উঠে এল তুষার পায়ে দলে।

দলের অন্যদের মতো তাগাই কিন্তু ক্লান্ত অবসন্ন হয় নি। দুস্তর অভিযানে পথ চলার সময় দেহের শক্তি যাতে অযথা নষ্ট না হয়, সেদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি থাকে সব সময়। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে ইয়াকটাকে এক টিলার সঙ্গে আংটা দিয়ে আটকে রেখে সে রওনা হলো, পার্টিজানরা যে দিকে গেছে।

কিছু পরে শোনা গেল গাঁয়ের কুকুরদের উন্মত্ত ক্রুদ্ধ চিৎকার। তাগাইকে ওরা অভ্যর্থনা করছে।

তুষার-নীচের অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে জুরার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয় বুড়ো সর্দারের।

ক্ষীণ কণ্ঠে বুড়ো প্রায় গোঙিয়ে উঠলো.—হায় হায়, জুরা, সব্বোনাশ! অসুস্থ আমি, বুড়ো হয়েছি। হঠাৎ এখন তাগাই এসে হাজির, আশ্রয় চাইছে। পার্টি-

জানদের সে নির্ঘাৎ খুন করবে, আর সে খুনের বদলা দিতে হবে আমাদের—নিজেদের রক্ত দিয়ে। কেউ আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিতে হয়। এটা চিরকেলে রীতি। সর্দার হয়ে সে রীতি আমি ভাঙতে পারি নে। তাই তুই যা, জুরা। তোর উঠতি বয়েস, শক্তি-সাহসও যথেষ্ট আছে। তাগাইকে গিয়ে বুঝিয়ে বল্—সে চলে যাক্। জয়নাব সেখানে পাহারা দিচ্ছে, নয়তো কুকুরগুলোকে তাগাইকে এতক্ষণে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেত।

বলতে বলতে বুড়ো কাশতে শুরু করলো।

ক্ষিপ্র পদে জুরা তুষার-নীচের সুড়ঙ্গ-পথে এগিয়ে গেল। সুড়ঙ্গের মুখের কাছে আসতে আসতে শুনতে পেল, তাগাই জয়নাবকে বলছে,—সত্যি, জোর বরাত বলতে হবে জয়নাব, পথ হারাই নি, তোমাদের গাঁয়ে এসে পৌঁছতে পেরেছি। তোমায় সওগাত দেবার জন্যে প্রচুর রেশম সঙ্গে এনেছি। কিন্তু সেসব রয়েছে কাফেলার সঙ্গে, এখান থেকে একদিনের পথ দূরে। আচ্ছা জয়নাব, রাতে থাকার জন্যে কারা আজ এখানে এসেছে, বল তো?

তাদের চিনি নে, তাগাই।—জয়নাব জবাব দেয়,—নিজেদের তারা পার্টিজান বলছে। তাদের কথা, তুমি নাকি ডাকাত, হিমানী-সম্প্রপাতে মারা পড়েছ।

সচকিত কণ্ঠে তাগাই জিজ্ঞেস করে,—ওরা দলে বুঝি বেশ ভারী?

মাত্র দুজন শুনে সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর বদলে গেল। চপল কণ্ঠে বললে,—আঃ কী রূপ তোমার, জয়নাব! কী মন-মাতানো ঐ ভ্রূ জোড়া আর দুষ্টুমি-ভরা চপল চোখ দুটো! সর্দার বুড়ো হয়েছে, আর জুরা তো বাচ্চা,—আমায় তুমি শাদী করো, জয়নাব! জান বুলবুল আমার, তোমার জন্যে কি চমৎকারই না মুক্তো-বসানো কয়েকগাছা নেকলেস আর রূপোর এক-ছড়া কটিহার এনেছি! শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছি, আমায় আগুনের ধারে নিয়ে চলো, লক্ষ্মীটি।

জুরা জানে, সে-ই বিয়ে করবে জয়নাবকে। তাই তাগাইয়ের কথাগুলো কানে যেতেই তার মেজাজ গরম হয়ে উঠলো। সুড়ঙ্গ-পথ থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল সে। পেছন থেকে সজোরে তাগাইয়ের কনুই চেপে ধরে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো,—অ্যাঁ তুমি!

চোখের পলকে জয়নাব উধাও। তাগাই এক ঝটকায় কনুই ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরে দাঁড়াল। জুরাকে দেখে যেন কত খুশী হয়েছে এমনি ভান করে হৈ হৈ করে উঠলো সে,—আরে, আরে পিয়ারের দোস্ত যে! তুমি?

কিন্তু জুরা নীরব। চোখে ক্রুদ্ধ চাউনি। সেটা লক্ষ্য করে উত্তপ্ত কণ্ঠে তাগাই বললে,—ব্যাপার কি? মেহমানকে খাতির-যত্ন করছো না যে বড়? আদবকায়দা ভুলে গেলে নাকি?

জুরা বললে,—চলে যাও এখান থেকে। তোমার জায়গা হবে না।

তাগাই ভাবলে, ঈর্ষায় পড়ে জুরা বুঝি এসব বলছে। কুৎসিত মুখভঙ্গি করে সে খেঁকিয়ে উঠলো,—কি বল্লি, বেয়াদব কুত্তার বাচ্চা? সর্দারকে ডাক্ তো, আদবকায়দা কাকে বলে তোকে শিখিয়ে দেবে।

দুরন্ত রাগে জুরার রক্ত মাথায় উঠে যায়। সে গর্জে উঠলো,—খবরদার তাগাই! সর্দারই একথা বলে দিয়েছে।

—মিথ্যে কথা! তুই মিথ্যেবাদী! মেয়েছেলের মতো মিথ্যে কথা বলছিস্! উপকারী দোস্তকে সর্দার কখনই একথা বলতে পারে না। আর নয়তো সে বে-দীন কাফের বনে গেছে, আল্লাকে আর মানে না।

নিদারুণ ঘৃণায় জুরা থুথু ফেললে। তাগাইয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল কুকুরগুলোর দিকে, যেন ওদের দিকেই তার সমস্ত মনোযোগ।

দুজনেই তখন দুজনের গলা কাটার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু দুজনেই কথা বলছে যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে। চেঁচামেচি বা গালাগালি করার অর্থ নিজেদের ইজ্জৎ নষ্ট করা, ঝগড়াটে মেয়েমানুষের পর্যায়ে নেমে আসা।

হুঁ, বুঝেছি!—হিংস্র কণ্ঠে তাগাই গর্‌গর্ করে উঠলো,—বুড়ো শেয়ালটা ধূর্তোমি শিখেছে! লাল শয়-তানদের সে ঠাঁই দিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, তবে রে বুড়ো পচা খাটাস! এ জন্যে তোকে পস্তাতে হবে...

বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর বদলে গেল। মধুমাখা গলায় এবার বললে,—যাক্ গে ভাই জুরা। আমায় মাফ করো, রাগের মাথায় যা বলেছি, ভুলে যাও। সত্যি-কার জোয়ান মরদ তুমি, তোমায় পরখ করছিলাম। শোন ভাই, আজ রাতে আমরা দুজনে পার্টিজানদের খুন করবো, তাদের রাইফেলগুলো নিয়ে নেব। তারপর কাল তোমায় আমি নিয়ে যাব এক দূর দেশে—সারিকলে। সেখানে লাল শয়তানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তুমি বিরাট একজন নামকরা ব্যক্তিকে সাহায্য করবে,—কি বলো?

শীতে তাগাইয়ের সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপছে, দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ উঠছে।

তেমনি ভ্রূ কুঁচকেই জুরা বললে,—যা বলেছি, তাগাই, চলে যাও এখান থেকে। পার্টিজানদের খতম করতে আমি একাই যথেষ্ট।

তাগাই তবু নাছোড়বান্দা। শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে আবার সে বললে,—শোন জুরা, তোমার বাবা বীর ইদীজকে সর্দার বিষ খাইয়ে মেরেছিল, জান? সর্দারের ভয় ছিল, তোমার বাবা হয়তো তার ধনদৌলত কেড়ে নেবে। তাই বলছি, এস আমরা দু-জনে আগে বলশেভিকদের খুন করি, তারপর আমি সর্দারকে খুন করবো। তাহলে জ্ঞাতি-খুনের পাপ তোমায় বর্তাবে না। তারপর তুমিই হবে গোষ্ঠীর মাতব্বর। আশা করি, আমার এ প্রস্তাবে এবার রাজী হবে তুমি।

ভয়ঙ্করভাবে জুরার ভ্রূ তখন কুঁচকে গেছে। বাবার রহস্যজনক মৃত্যুর দৃশ্য তার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। গাঁয়ের সবাই বাবাকে ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো।

কয়েক মুহূর্তের জন্য জুরা যেন কেমন হয়ে যায়। বড় বিচলিত মনে হয় তাকে।

তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে হঠাৎ খাপ থেকে সে ছোরা টেনে বের করলে, দৃঢ় কঠোর কণ্ঠে বললে,—চলে যাও বলছি এখান থেকে!

তাগাইও ঝটকা মেরে রিভলবার টেনে নিলে।

তরুণ শিকারীর মুখে তিক্ত নীরস হাসি ফুটে উঠলো। সে বললে,—করো, গুলি করো! গুলির আওয়াজ পার্টিজানদের কানে যাবে, তারা বেরিয়ে এসে খতম করবে তোমায়।

তাগাই রিভলবার সরিয়ে নিতে নিতে বিষাক্ত কণ্ঠে যেন হিস হিস করে উঠলো,—মনে রাখিস্, তোকে আর তোর গোষ্ঠীর সব্বাইকে রক্ত দিয়ে আজকের এই বেয়াদবির দাম শুধতে হবে।

জুরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। দেহের একটা মাংস-পেশী পর্যন্ত নড়ছে না।

আর দ্বিরুক্তি না করে তাগাই ফিরলো।

মচ্‌মচ্‌ শব্দে তুষার গুঁড়ো হবার শব্দ ওঠে তার জুতোর তলা থেকে।

মিন-আরখার থেকে যাতায়াতের পথ তার জানা। সেই পথ ধরে সে রওনা হয় এক গোপন জায়গার উদ্দেশে। শেষবার সে যখন কাশগড় থেকে বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিল, তখন বেশ কিছু গরম জামাকাপড়, খাবারদাবার, জ্বালানি ইত্যাদি তারা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল সেই গোপন জায়গায়।

॥ আট ॥

নিজের কুঠরিতে চামড়ার শয্যায় শুয়ে জুরা ছটফট করছে। আর আগুনের পাশে বসে ভেড়ার কাঁধের পেছনের একখানা চ্যাপ্টা হাড় নিয়ে ভবিষ্যৎ গণনা করছে আয়েশা। ছেলের দিকে সে তাকায়। শেষে একসময় জিজ্ঞেস করলে,—হাঁ রে, কি হলো তোর?

জুরাও ঠিক জানে না, কি হয়েছে। সে কল্পনায় দেখছে, লোহার কার্পেটে চড়ে দূর আসমানে পাড়ি দিচ্ছে সে। ঈগলের মতো আসমান থেকে সে দেখতে চায় নীচের দুনিয়াটাকে।

নিজের কুঠরিতে বসে ক্ষুধার্ত কুচাক জেগে স্বপ্ন দেখছে। এমন এক কল্পলোকের স্বপ্নে সে বিভোর, যেখানে সবাই প্রাণ ভরে খেতে পায়।

অন্ধকারে বসে ফিস ফিস করছে বুড়ি ও কিশোর-কিশোরীর দল।

মুসা ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্লান্ত ইভাস্কো ঢুলছে। মুসলমানী আইনকানুনের ওপর তার আস্থা নেই। তাই ঠিক হয়েছিল, পালা করে তারা পাহারা দেবে ও ঘুমোবে।

প্রথম রাতে এখন ইভাস্কোর পাহারা দেবার পালা। কিন্তু ঘুমের তাড়নায় সে চোখই খুলে রাখতে পারছে না, তা পাহারা দেবে কি! ঢুলতে ঢুলতে শেষে এক-সময় সে নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠলো,—ধুত্তোর ছাই! জাহান্নামে যাক্ ওরা! খুন করবে, করুক! চোখই মেলতে পারছি নে, তা পাহারা দেব কি!......

ইভাস্কো ঘুমিয়ে পড়লো।

আগুন নিভে যায় ধীরে ধীরে।

স্তব্ধ রাত্রি। ভেতরে অন্ধকার...

নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে ঘুমন্ত পার্টিজানদের দিকে এগিয়ে আসছে আয়েশা। হাতে ছোরা। তাজিকের মাথার একগোছা চুল তার চা-ই চাই। আধিব্যাধির মোক্ষম দাওয়াই এ চুল। এটা ওদের জন্মগত সংস্কার।

পার্টিজানদের সঙ্গেই রয়েছে বাসমাচী কুকুরটা। পাশে শুয়ে আছে। আয়েশার পায়ের শব্দ কানে যেতেই সে গরগর করতে করতে উঠে দাঁড়াল।

সর্বনাশ! কুকুরটার কথা বুড়ির মনেই নেই। ঘাবড়ে গিয়ে সে দৌড় মারলে পালানোর জন্যে। পেছনে ধেয়ে এল কুকুরটা। কিন্তু পরক্ষণে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েই, সে পিছু হটে এল।

দরজার বাইরে সর্দারের বিশালদেহী কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে। একটা মাত্র চোখ তার, তাই নাম এক-চোখো। অন্ধকারে আগুনের ভাঁটার মতো ঐ একটা চোখই নবাগত কুকুরটার নজরে পড়েছে।

ভয়ে ও উত্তেজনায় নবাগতের গায়ের লোম খাড়া

হয়ে ওঠে। দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো সে। ঘুমন্ত লোক দুটির পাশে হটে এসে পেছনের পা দিয়ে সে কামরার মেঝে আঁচড়াতে শুরু করে। তারপর একসময় তার ভয় ও উত্তেজনা কমে এল ধীরে ধীরে। সামনের প্রসারিত থাবার ওপর মাথা রেখে আবার শুয়ে পড়লো সে।

দরজার বাইরে থেকে অস্পষ্ট ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে। জুরা সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে কামরায় ঢুকছে। হাতে লম্বা হাতল-দেওয়া একখানা কুড়ুল।

কুকুরটা আবার গরগর করতে শুরু করে। ঘুমের মধ্যে মুসা ও ইভাস্কো জোরে কি যেন বিড়বিড় করে উঠলো।

মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, ওরা দুজনে গভীর ঘুমে অচেতন।

কুকুরটা গোঁ গোঁ করে উঠলো। এবার আরো জোরে। জুরার ভয় হলো, ডাকাতরা জেগে না ওঠে। মুসা ও ইভাস্কোকে সে ডাকাত বলেই ধরে নিয়েছে। আর তার এগোতে ভরসা হয় না। অন্ধকারে পেছু হটতেই সে আচমকা মায়ের অর্থাৎ আয়েশার ঘাড়ে এসে পড়লো।

অন্ধকারে দুজনে হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর পরস্পরের উদ্দেশ্য খোলসা হতেই, তর্ক বাধলো মা ও ছেলের মধ্যে। বুড়ি চায় জ্যান্ত তাজিকের মাথার এক-গোছা চুল। কিন্তু জুরা বলে, তা হবে না, আগে সে ডাকাতদের রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে তাদের খুন করবে, তারপর মা মরা তাজিকের মাথা থেকে যত গোছা চুল দরকার কেটে নিক। আয়েশা যত বোঝায়, কিন্তু জুরার সেই এক গোঁ। আয়েশা এবার শেষ অস্ত্র ছাড়লে, বললে,—সর্দারের মত না নিয়ে লোকদের খুন করা কিন্তু কখনই সংগত হবে না। হাজার হোক, ওরা মেহমান।

এ অস্ত্রে কাজ হয়। মায়ের কথায় রাজী হয় জুরা। রফা হলো, কুকুরটাকে আগে ওখান থেকে সরাতে হবে। তারপর আয়েশা একগোছা চুল কেটে নেবার পর জুরা রাইফেল দুটো নিয়ে তাজিক ও কির-ঘিজ দুটোকেই খুন করবে।

কিন্তু কুকুরটাকে সরানো যায় কি করে? ওকে না সরাতে পারলে সব মতলবই ভণ্ডুল।

জুরা কি ভাবলে। পরক্ষণে বাবুকে ডেকে নিয়ে নিজের কামরায় বাতির ধারে গিয়ে সে বসলো। তারপর বাবুর মাথা দু হাতে চেপে ধরে সে নিষ্পলক চোখে তাকালো তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দিকে।

প্রথম প্রথম বাবু হাই তুলে মুখ বেঁকিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে আর কত-ক্ষণ! শেষ পর্যন্ত সে বাধ্য হয় জুরার চোখে চোখ রাখতে। কিছুক্ষণের মধ্যে চোখ সরিয়ে নেবার ক্ষমতাও তার লোপ পেল।

বাবুর মাথা জুরা দু হাত দিয়ে পিষছে। এত জোরে পিষছে, যাতে সে ব্যথা পায়। পিষতে পিষতে তার কানে কি যেন সে বলে চলেছে ফিস ফিস করে। বাবুর তখন বাইরের গন্ধ, ব্যথা ও শব্দ অনুভব করার শক্তি নেই। সে শুধু জুরাকে দেখছে, জুরার কথাই শুনছে।

শেষে একসময় বাবুকে ছেড়ে দিলে জুরা। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর করে ঘাম ছুটছে। বাবুর নাকে আবার গুলজান ও গোবরের পরিচিত গন্ধের সুড়সুড়ি লাগতেই সে হেঁচে উঠলো।

দূর থেকে গাঁয়ের অন্য কুকুরদের বিষণ্ণ কণ্ঠের ডাক ভেসে আসছে। একটানা করুণ আর্তনাদ যেন। আয়েশার বুড়ি কুকুরটা আর্তনাদ করছে সবচেয়ে জোরে। একবার গেঙাতে শুরু করলে সে থামতে চায় না।

বাবু হামাগুড়ি দিয়ে কামরায় ঢুকলো। ঘুমন্ত পার্টিজানদের পাশে নবাগত কুকুরটা শুয়ে আছে। বাবু সোজা এগিয়ে যায় তার দিকে।

বাবুর গায়ের গন্ধ নবাগতের নাকে আগেই গিয়ে-ছিল। বাবুকে দেখে ওর কান খাড়া হয়ে উঠলো। কাটা লেজের গোড়া নাড়তে নাড়তে বাবু এগিয়ে আসছে তার দিকে। সে মাদী কুকুর, তবু শঙ্কায় নবাগতের লেজ ঝুলে পড়েছে, কান পেছনে চলে গেছে। কিন্তু বাবু কাছে এগিয়ে আসতেই, তার হাবভাব পালটে গেল। সানন্দে দাঁত বের করে সে লেজ নাড়তে শুরু করলো।

আরো এগিয়ে গিয়ে বাবু তার নাক শুঁকলো। মাটিতে মাথা নামিয়ে খাড়া লেজটা নাড়ছে সে বারবার। ভরসা পেয়ে নবাগতও জবাব দেয় জোরে লেজ নেড়ে।

বাবু এবার সামনের দিকে কয়েকবার লাফ দেয়। আর বারবার শুয়ে পড়তে থাকে মাটিতে বুক ঠেকিয়ে।

নবাগতের মনে আর শঙ্কা নেই। মহাখুশিতে বাবুর কাছে এগিয়ে এল সে। অমনি হঠাৎ দেহ বেঁকিয়ে, ভঙ্গিমা করে বাবু ছুট দিলে অন্ধ-কারের দিকে। নবাগতও ছুটলো তার পেছনে। বাবুর গমন-পথের তীব্র গন্ধ অনুসরণ করে তুষার-তলের সুড়ঙ্গপথ ধরে সে ছোটে। ক্ষণপরে সে লাফিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে—তুষার-ঝলমলো জোছনা-ঢালা নীলাভ রাত্রির মাঝে।

বাবুর নাগাল পাবার জন্যে নবাগতের তখন আর কোন দিকে লক্ষ্য নেই, ছুটছে সামনের দিকে। হঠাৎ সে অন্য আর একটা কুকুরের ঘাড়ে গিয়ে পড়লো। ডিগবাজি খেয়ে নিদারুণ ভয়ে সে লাফিয়ে উঠলো, লাফ মারলো পেছনে কামরার সুড়ঙ্গ-দরজার দিকে। কিন্তু দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে প্রকান্ড এক কালো কুকুর—সেই এক-চোখো! মুহূর্তের মধ্যে কুকুরের পাল নবাগতকে ঘিরে ফেললে চারদিক থেকে।

নবাগতের কান পেছনে চলে গেছে। লেজ পেটের নীচে এমন ভাবে সেঁধিয়েছে যে, তার আগা চলে এসেছে প্রায় সামনের থাবা পর্যন্ত। হতভাগ্য জানোয়ার দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো। গায়ের লোম তার খাড়া হয়ে উঠেছে। পিঠ বেঁকে গেছে ধনুকের মতো। নিজেকে আরো বড় আরো ভয়ঙ্কর দেখানর জন্যে হিংস্র দাঁত বের করে সে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

কিন্তু ক্রুদ্ধ কুকুরের পাল ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে—নিশ্চল নিশ্চুপ। ঠান্ডা নিষ্পলক দৃষ্টি তাদের চোখে। নবাগত আতঙ্কে দিশেহারা। সব দিক থেকে আক্রান্ত হবার ভয়ে সে পাগলের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। কুকুরের পাল তবু নড়ছে না। শুধু আরো জোরে আরো ঘন ঘন পড়ছে তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস।

মারাত্মক বিপদের সঙ্কেত সর্বদিকে। নবাগত আর্তনাদ করতে শুরু করলো। তার ঠ্যাং কাঁপছে। কেঁউ কেঁউ করে সে করুণা মাগছে। সে চায়, ওরাও তার ডাকে সাড়া দিক। তাহলে অর্থাৎ ওরা ডাকলে, হয়তো সে রেহাই পেয়ে যেতে পারে।

হিমেল রাত্রির স্তব্ধতার মাঝে দূর থেকে শব্দ ভেসে আসে। তুষারের ওপর দিয়ে কে যেন হাঁটছে সন্তর্পণে। আয়েশা গুড়ি মেরে এগোচ্ছে ঘুমন্ত পার্টিজানদের দিকে। কিন্তু সেদিকে নবাগত কুকুরটার লক্ষ্যই নেই।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুধার্ত প্রকান্ড কুকুর-গুলো। হিংস্র আক্রোশে চোখগুলো জ্বলছে। দল-পতির সঙ্কেতের অপেক্ষা শুধু।

কিন্তু সবার ছোট কুকুরটার বুঝি আর দেরী সইল না। সে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো নবাগতের ওপর।

নবাগত হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান। এক লাফে সরে গিয়ে সে রোগা কুকুরটার কান কামড়ে ছিঁড়ে দিলে, তাকে পেড়ে ফেললে বরফের ওপর।

ককাতে ককাতে হামলাকারী ছুটে পালাল। কিন্তু কুকুরের পাল তবু নিশ্চল নিশ্চুপ। চোখের দৃষ্টি তাদের লকলক করছে ভয়ঙ্কর হিংস্রতায়। সেদিকে তাকিয়ে নবাগতের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাবার মতো। আবার সে আর্তনাদ করে ওঠে।

এক-চোখো শেষে উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল সামনের দিকে। একটা চোখের ক্রূর দৃষ্টি নবাগতের ওপর নিবদ্ধ। লেজ নাড়লো সে। নবাগত মহাখুশী, যেন বর্তে গেছে—এক-চোখোকে খাতির করার ভঙ্গিতে শরীরটা সে লম্বা করে দিলে সামনের দিকে। ভয় তার অবশ্য মোটেই কাটে নি, লেজ পেটের নীচে তেমনি সেঁধিয়ে আছে।

এক-চোখো আবার এগিয়ে গেল আরো কয়েক পা। নবাগত এবার ঘাবড়ে যায়। কোথায় উবে গেল তারা শক্তি-সাহস! আকাশে চার-পা তুলে চিৎ হয়ে পড়লো সে। সবচেয়ে যে বলবান, তার করুণার ওপর নিজেকে সে সমর্পণ করলো বিনা যুদ্ধে।

চোখের পলকে এক-চোখো তার টুঁটি কামড়ে ধরলো। গোটা দলটা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। মরার আগে নবাগত ক্ষীণতম শব্দ করারও সুযোগ পেল না। তার টুঁটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

ঠাসাঠাসি-করা কুকুরের পাল। তার ভেতর থেকে গরম ধোঁয়া উঠছে। বাতাসে জমে গিয়ে তা হিমকণার আকারে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের লোমশ দেহের ওপর।

তারপর সব শেষ হয় এক সময়।

বাবু চাঁদের দিকে মুখ তুলে বিষণ্ণ কণ্ঠে ককিয়ে ওঠে একসময়। তাকে ঘিরে অন্য কুকুরগুলোও যোগ দেয় তাতে। তাদের জোরালো করুণ কণ্ঠের একটানা ঐকতান কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যায় নিশুতি রাতের স্তব্ধতায়। মিলিয়ে যায় মেঘেরও ওপারে অসীম শূন্যতার মাঝে। প্রতিধ্বনি জাগে না।

কুচাকের লাললোমওলা আর আয়েশার ছাইরঙা কুকুর দুটো কিন্তু তখনও তুষারের ওপর জমাট রক্তমাখা কি একটা চিবোতে চিবোতে পরস্পরের প্রতি সমানে তর্জন-গর্জন করে চলেছে।

অন্ধকার! কামরার ভেতরে অন্ধকার।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে মুসা ও ইভাস্কো।

কে ও?

সন্তর্পণে জুরা কামরায় ঢুকছে।

তারপর স্বল্পস্থায়ী লড়াইয়ের পর আধ-ঘুমন্ত পার্টিজানদের সে বেঁধে ফেললে।

খবরদার!—সে শাসিয়ে উঠলো,—চোখ মেলবি নে,

চোখ উপড়ে ফেলবো! টুঁ শব্দ করবি তো জিভ কেটে ফেলবো!

রাইফেল দুটো সে তুলে নেয়। গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করতে থাকে সেগুলো।

মুসা ততক্ষণে পুরোপুরি জেগে গেছে। সে চেঁচিয়ে উঠলো,—আমি দোভাষী, মুসলমান। আমার বাঁধন খুলে দাও। শুধু দোভাষীর কাজই আমি করি।

কিন্তু ওতে কাজ হয় না।

জুরার জবাব এল,—ঘাবড়াও মাৎ! ভেড়াকে পায়ের দিকেই বাঁধতে হয়, তা সে সাদাই হোক আর কালোই হোক।

হৈচৈ চেঁচামেচি সর্দারের কানে যায়। উদ্বেগ-উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে সে এসে কামরায় ঢুকলো।

হতভাগা ছোঁড়া!—তীক্ষ্ম কণ্ঠে সর্দার গর্জে উঠলো,—নীরেট আহাম্মক কোথাকার! করেছিস কি? দীনদার কেউ কখনো নিজের বাড়িতে মেহমানদের ওপর বাটপাড়ি করে, তাদের খুন করে শুনেছিস? আইন হলো, নিজের বাড়িতে তাদের খাতির-আত্তি করবি, দানাপানি দিবি, তাদের পথে তারা চলে যাক। তারপর চাস্ তো, পথে তাদের খুন করবি, কেড়ে-কুড়ে নিবি!

জুরা চটে উঠলো। বললে,—থামো, বুড়ো, ভাগো এখান থেকে। অন্ধকারে নিজের পথ আমি নিজেই খুঁজে নেব। হাতিয়ারগুলো নিয়েছি, এবার ওদের খতম করবো।

সর্দার গর্জে উঠলো আবার,—নচ্ছার আধপাগলা শয়তান! এ বয়েসে আমি অনেক দেখলাম, শুনেছিও অনেক। গত বছর তাগাইয়ের বাবা সেই ব্যাপারী কি বলেছিল জানিস্? বলেছিল, একটা তাজিককে খুন করলে একশো তাজিক তার জায়গায় এসে হাজির হয়।

না না, হাজার!—মুসা চেঁচিয়ে উঠলো,—একশো হাজার তাজিক বলশেভিক এসে হাজির হবে। যদি ভাল চাও, মরতে না চাও তো, আমাদের ছেড়ে দাও। জুরা আমাদের ওপর হামলা করেছে সত্যি, তবু হলফ করছি. ওর গায়ে আমরা হাত দেব না।

বাঁধন ছেঁড়ার জন্য ইভাস্কো তখন মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

তীব্র কঠোর কণ্ঠে সর্দার শাসিয়ে উঠলো,—হতচ্ছাড়া পাজী ছোঁড়া! তোকে আমি শাপ দেব বলছি। চীনা ব্যাপারীরা যে কেতাবখানা দিয়ে গেছে, তা থেকে আমি আখের গণে দেখেছি জানিস! দেখেছি, মেহমানদের ছেড়ে দিতে হবেই। তা নইলে আল্লার গজব পড়বে তোর ওপর, সারা গাঁয়ের ওপর।

জুরা ঘাবড়ে যায়। সর্দারের শেষ কথায় প্রতিবাদ করার বাকী ক্ষমতাটুকুও তার উবে গেল।

ধীরে ধীরে রাইফেল দুটো সে নামিয়ে রাখলে মেঝের ওপর।

মুসা ও ইভাস্কো বেঁচে গেল সেবারের মতো।

পরদিন সকালে গ্রাম ত্যাগ করার সময় জুরার ম্যাচলক গাদা বন্দুকটাও তারা সঙ্গে নিলে।

সারা গাঁয়ে ঐ একটাই মাত্র বন্দুক। শিকারের জন্যে ওটা রেখে যেতে ইস্কান্দার ও আয়েশা অনেক কাকুতি-মিনতি ধরাধরি করলে।

কিন্তু ইভাস্কো অনড়। মুসার মারফৎ সর্দারকে বললে,—তোমায় ধন্যবাদ, বৃদ্ধ। তুমি আমাদের আশ্রয় দিয়েছ, শীতের হাত থেকে বাঁচিয়েছ। তোমার জন্যেই জুরাকে আমরা মাফ করেছি। কিন্তু আমাদের হাড়-গোড় এখনো ব্যথায় টনটন করছে। তার ওপর ফেরার পথে জুরার বুলেট খাব, সে সাধ আমাদের নেই। গ্রীষ্মের সময় আবার আমরা আসবো। আসবো তোমাদের জন্যে খাবারদাবার, রসদপত্র আর সূতীর ছাপানো কাপড়চোপড় নিয়ে। পুরনো এই বন্দুকটাও সঙ্গে আনবো সে সময়।

নেতাজী

শান্তশীল দাশ

হে বীর নেতাজী, লহ প্রণাম।
সারা ভারতের অন্তর মাঝে
সদা জাগ্রত ও প্রিয় নাম।
দেশ জননীর শৃঙ্খল ভার
মোচনের তরে ব্রত যে তোমার;
সে-ব্রত সাধিতে সারাটি জীবন
করে গেছ তুমি কী সংগ্রাম!

সেই সাধনার হয়নি তো শেষ
আজো কী বেদনা দেশের ভালে;
তাই বুঝি তুমি আরো দুঃসহ
সাধনা-নিরত অন্তরালে!
দেখা দেবে তুমি সেই প্রিয় বেশে
মহানায়কের রূপ ধরে এসে;
সে-রূপ স্মরণ করি শ্রদ্ধায়
চরণে অর্ঘ্য তুলে দিলাম।

নেই নেই

সরল দে

এটা নেই ওটা নেই
নেই তার কিছুটি,
দাঁতে নেই পোকা আর
চোখে নেই পিঁচুটি।

কানে তুলো গোঁজা নেই
নেই চোখে ঠুলিও,
নেই তার একেবারে
'নেই নেই' বুলিও।

ঘরে নেই ছোট-বড়
ওষুধের শিশিও,
গায়ে হাত বুলোবার
নেই মাসি-পিসিও।

পাওনাও নেই তার
নেই ধার-কর্জ,
সেই লোক নেই মোটে—
ভারী আশ্চর্য!!

শীত ঃ শীত

করুণাময় বসু

মিষ্টি রোদের বিষ্টি যেন পৌষের এই শান্ত দুপুর বেলা,
ভুল করে কি ফুলবাগানে আজ বসেছে ক্লান্ত পাখির মেলা;
ঝরা কুসুম ঝরিয়ে ক্ষণে ক্ষণে,
মরা পাতা উড়িয়ে দিয়ে বনে
মাঠের ধারে, দিঘির পাড়ে কোন খেয়ালীর চলছে একী খেলা!

পুলি পিঠের গন্ধ মিঠে আসছে ভেসে দূরের পাড়া থেকে.
হাসির গানে, বাঁশির তানে ভরালো কে সুরের ছবি এঁকেঃ
বুড়ি-র ছোঁয়া খেলতে কারা আসে,
ঘুড়ির ছোঁয়া দূরের নীলাকাশে,
মিষ্টি সুরে শিষ-টি দিয়ে দোয়েল পাখি স্বপ্ন গেল রেখে।

বেলা শেষের খেলার পরে ফিরছে ঘরে টুটুল, পুপু সোনা,
আতা গাছের পাতার ফাঁকে উঠলো হেসে ছোট্ট চাঁদের কণা।
ছাদের ধারে বকুল গাছে ক্রমে
রাতের আঁধার উঠলো শীতে জমে,
জড়িয়ে মাকে টুটুল ডাকে, পারুল বোনের রূপকথাটি
শোনা।

বগীতলার মেলা

প্রীতিভূষণ চাকী

মেলা বসলো
মেলা বসলো,
বগীতলার মেলা—
অজয় নদীর
কোলে ভাসলো
সবুজ খুশির ভেলা।

বাসা বাঁধ না
বাসা বাঁধ না
মেলার কোণে বাসা—
সবার মনে
ছড়িয়ে দে না,
অগাধ ভালবাসা।

রিম ঝিম ঝিম
রিম ঝিম ঝিম
বাজলো একতারা,
হৃদয়ে হৃদয়ে
জেগে উঠলো
নতুন গানের সাড়া!

খেলনা হাতি
সওদা পাতি
ইচ্ছে মত কিনে—
খোকা খুকু
দ্যাখ্ চললো
গাঁয়ের পথ চিনে!

বেলা ফুরোল—
ধুলো উড়োল,
চললো বোঝাই গাড়ি;

মেলা ভাঙলো
মন রাঙলো,
ফিরলো সবাই বাড়ি!

লিমেরিক

পরিতোষকুমার চন্দ্র

(১)

দিনের বেলা চাঁদের আলো সৃষ্টিটা কি ওলটালো,
অস্ত যাচ্ছে পূবে রবি পথটা কি তার পালটালো?
রোদের সময় বৃষ্টি ঝরে
তারা ফোটে আকাশ পরে
ব্যাপার দেখে বিধাতা কি স্বর্গ ছেড়ে সটকালো?

(২)

কতোই বা তার বয়স হবে, এত্তোটুকু পুঁচকে,
বুক ফুলিয়ে, হাত ঘুরিয়ে চোখ দুটোকে কুঁচকে,
বললে, কাল মাঝের রাতে
বাঘ মেরেছি বাড়ীর ছাতে,
নয়কো জেগে, ঘুমের মাঝে, বললে হেসে মুচকে।

(৩)

ঘোষেদের গণশার মাথা ভরা বাবরি,
সারা গ্রাম থরহরি শুনে তার দাবড়ি।
দিনরাত খাই খাই,
বলে, শুধু আনো ভাই,
শিম, ডিম, কচু, ঘেঁচু, করলা বা রাবড়ি।

(৪)

গয় গবাক্ষ দেখবে যদি যাও তবে ভাই বোম্বে,
চোখে তাকে দেখলে তোমার মাথা ব্যথা কমবে।
মাথার তার চুলের জটা,
টেনে ছিঁড়ে আনলে ছটা,
নরম তোমার মাথার ঘিলু বরফ হয়ে জমবে।

পদ্মা নদীর তীরে

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

সোনালী রোদের আলো-ঝলমল পদ্মা নদীর জল
ঢেউয়ের ফেনায় কুলুকুলু রবে বয়ে চলে অবিরল
সবুজের খেত এধারে-ওধারে
নারিকেল সারি কাঁপিছে সমীরে
উদাস দুপুরে উর্ম্মি নূপুরে হয়ে ওঠে চঞ্চল
মেঘের আঁচলে, কাকচোখ জলে ছায়া কাঁপে ছলছল।

শ্যামলা নদীর কত-কত রূপ আজো পড়ে মোর মনে
স্মৃতির বেদন মনের গভীরে সুর তোলে ক্ষণে-ক্ষণে
বোশেখী দুপুরে এক হাঁটু জলে
গাঁয়ের ছেলেরা কত কুতূহলে
করে মাতামাতি মিলে সব সাথী প্রাণের বিপুল টানে
ঘুঘু ডাকে দূরে, ক্লান্তির সুরে পাতা কাঁপে অকারণে।

আষাঢ়-প্রাতের স্তব্ধ প্রহরে গুরু-গুরু মেঘ ডাকে
সজল হাওয়ায় পদ্মার জলে কত না ছবি সে আঁকে
বিজুলির আলো কেঁপে-কেঁপে যায়
ধানের হাওয়ায় কাঁদে একা হায়
রূপকথা আজ আবেশ জাগায় মনের গোপন ফাঁকে
কালো-কালো জল একূল-ওকূলে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

পদ্মার জলে বেলে হাঁস যত সারাদিন করে খেলা
মেঘ-রোদ্দুর আলোছায়া রচে কেটে যায় সারাবেলা
সন্ধ্যার ছায়া তারপরে নামে
যত কোলাহল সব কিছু থামে
চাঁদের আলোয় সুপ্তি-মগন পদ্মার বালুবেলা
দূর নীলিমায় তারকার দল রচে স্বপ্নের মেলা।

প্রভু খৃষ্ট হে

শিশির মজুমদার

প্রেম করুণা শান্তির তুমি অমর পথিকৃৎ
খৃষ্ট, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি সবার সংবিৎ।
নিজের জীবন জ্বালায়ে তুমি জগৎ করেছ আলো
তবুও দেখি ঘাতকের মুখ হয়নি তো কভু কালো।
তাদের মুখোশ শান্তির আর প্রেমের করুণাধারায়
ভাসছে ভাসছে সদাই ভাসছে দুখীর কান্না মায়ায়।
এবার প্রভু খৃষ্ট হে,—আর কোন ক্ষমা নাই
মিথ্যার যারা ব্যবসা করে তাদের শাস্তি চাই।
করুণা শান্তি প্রেমের আলোক ফুটুক নতুন করে
নির্দোষ যারা, যারা নতমুখ, শত অপমানভরে।

বিক্রমাদিত্যের গল্প

ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন আগে এই ভারতে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। রূপেগুণে আর বীরত্বে তাঁর জোড়া রাজা আর একজনও ছিলেন না তখনকার দিনে। তাঁর নাম ছিল বিক্রমাদিত্য। কিন্তু বিক্রমাদিত্য কথাটার মানে কি জানো? সূর্যের মতো তেজস্বী! বিক্রমাদিত্যের প্রকৃত নাম ছিল কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। রাজা চন্দ্রগুপ্তই 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি নিয়ে ভারতের সিংহাসনে বসেছিলেন। তাঁরই সভাতে 'নবরত্ন' ছিল আর কবি কালিদাস ছিলেন সেই নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন।

রাজা বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে। সেগুলোর সবই যে সত্য, তা মনে করার কিন্তু কোনো কারণ নেই। তবে হ্যাঁ, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' আর 'বত্রিশ সিংহাসনের গল্প' তাঁকে নিয়েই যে লেখা হয়েছিল, তা আমরা জানি।

রাজা বিক্রমাদিত্য এতো বড় বীর ছিলেন যে, স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তাঁকে এই বত্রিশ সিংহাসনটি উপহার দিয়েছিলেন। সিংহাসনটি ছিল রত্নের তৈরী আর তাতে বত্রিশটি সোনার পুতুল ছিল। রাজা বিক্রমাদিত্য মারা যাবার পর ভোজরাজা এই সিংহাসন অধিকার করেন এবং তাঁরই আমলে এই সিংহাসনের বত্রিশটা সোনার পুতুল রাজা বিক্রমাদিত্যের বীরত্বের বত্রিশটা গল্প বলে একে একে স্বর্গরাজ্যে চলে যায়। আসলে এই সোনার পুতুলগুলো ছিল দুর্গার সহচরী। কোন এক কুপিত মুনির অভিশাপে তারা বত্রিশটা সোনার পুতুলে পরিণত হয়েছিল। এখন ভোজরাজাকে রাজা বিক্রমাদিত্যের বীরত্বের যে গল্প এরা শুনিয়েছিল তারই একটি আজ আমি তোমাদের বলছি, শোন।

রাজা বিক্রমাদিত্য রাজসভায় বসে আছেন, এমন সময় একজন কাপালিক সন্ন্যাসী এসে রাজাকে একটা ফল দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন। মাথায় বিরাট জটা—কপালে আঁকা সিঁদুরের বিরাট ফোঁটা আর মুখে চোখে তাঁর বিরাট একটা গাম্ভীর্য। এমনিভাবেই সেই সন্ন্যাসী প্রত্যহ আসতে আরম্ভ করলেন আর বিক্রমাদিত্যকে রোজই একটি করে ফল দিয়ে আশীর্বাদ করে যেতে লাগলেন।

মহারাজ রোজই তাঁর হাত থেকে ফল নিয়ে তাঁর ভাণ্ডারীকে তা রেখে দেবার আদেশ দিতেন। একদিন হঠাৎ রাজার হাত থেকে একটা ফল মাটিতে পড়ে ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে গেল। শুনলে তোমরা অবাক হবে যে তার মাঝখান থেকে একটা মানিক ঠিক্‌রে পড়লো। সাত রাজার ধন-সম্পত্তি জড় করলে তবে একটা মানিকের দাম হয়—তা তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। রাজা বিক্রমাদিত্য তখন ভাণ্ডারীকে আগের ফলগুলো আনতে আদেশ দিলেন। ভাণ্ডারী সেগুলো আনতেই সেগুলো ভেঙে রাজা বিক্রমাদিত্য দেখলেন প্রত্যেক ফলের মাঝেই একটি করে দামী মানিক লুকানো আছে। রাজা আর সভাসদরা বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন।

পরদিন সন্ন্যাসী আবার এলেন ফল নিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ জানাতে। রাজা তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনার উদ্দেশ্য কি তাই আগে বলুন—প্রত্যেকদিন এমনিভাবে মণি দেবারই বা কি অর্থ?'

সন্ন্যাসী একটুখানি হাসলেন। তারপর বললেন : 'আগামী অঘ্রাণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে আমি এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করব আর তাতে আমার সহায় হতে হবে তোমাকেই রাজা!'

'আপনার কি উপকারে আমি লাগতে পারি প্রভু, তা বলে আমার চিন্তা দূর করুন।' রাজা বিনীতভাবেই জানালেন সন্ন্যাসীকে।

কাপালিক সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন : 'তা জানি বৎস—তাইতো তোমাকেই আমি এই মানিকগুলো দিয়ে আশীর্বাদ করেছি। উজ্জয়িনীর মহাশ্মশানে তুমি আমার কাছে যাবে আগামী কৃষ্ণাচতুর্দশীতে—তারপর সেখানেই সমস্ত কিছু জানতে পারবে তুমি বৎস!'

'আমি নিশ্চয়ই যাবো—আপনার কোনো উপকারে লাগলে এ জীবন আমার ধন্য হবে প্রভু।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের আশ্বাস পেয়ে সেই বিরাট কাপালিক চলে গেলেন। রাজাও নির্দিষ্ট সময়ে সেই মহাশ্মশানে এসে হাজির হলেন। ভীষণ অন্ধকার চারিদিক ঘিরে ধরেছে—বিরাট সেই শ্মশানের এখানে ওখানে নরমুণ্ড আর নরকংকাল ছড়ানো রয়েছে—তারই মাঝখানে ধুনি জ্বালিয়ে কাপালিক যজ্ঞে বসেছেন। রাজা তাঁকে প্রণাম জানালেন। কাপালিক বললেন : 'এই মহাশ্মশানের পশ্চিম কোণে একটা বটবৃক্ষ আছে—সেই বটবৃক্ষের ওপর একটা মৃতদেহ ঝুলছে, ওটাই তোমাকে এনে দিতে হবে। কিন্তু খবরদার আনবার সময় যেন কোনো কথা বলো না।'

'তাই হবে প্রভু—আমি এখুনি ওই মৃতদেহ আপনার সম্মুখে এনে হাজির করছি।'

'হ্যাঁ তাই যাও। ওই মৃতদেহ আহুতি দিয়েই আমি বেতালসিদ্ধ হতে চাই বৎস!'

রাজা বিক্রমাদিত্য বরাবর পশ্চিম দিকে যেতে শুরু করলেন এবং বেশ কিছু সময় যাওয়ার পরই কাপালিক-নির্দিষ্ট সেই বটবৃক্ষের নিকট এসে হাজির হলেন। দেখলেন গাছের ওপর প্রকৃতই একটা মৃতদেহ টাঙানো আছে বটে! বীর বিক্রমাদিত্য মোটেই তাতে ভীত হলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ কাপালিকের কথা মতো সেই বটগাছে উঠে মড়াটাকে কাঁধে চাপিয়ে নীচে নেমে এলেন। কিন্তু মাটিতে পা দেবার সাথে সাথেই মড়াটা হঠাৎ কথা বলে উঠলো : 'রাজা আমি আপনাকে পঁচিশটি গল্প বলবো আর গল্পের শেষে একটি করে প্রশ্ন করবো—প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব যদি আপনি দিতে পারেন তবেই আমি আপনার সঙ্গে যাবো!'

মহারাজ বিক্রমাদিত্য কথা না বলে ইঙ্গিতে সেই মৃত ব্যক্তি বেতালের কথায় রাজি হয়ে গেলেন। বলতে ভুলে গেছি এই মড়াটার নামই বেতাল। সারারাত ধরে সেই বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে পঁচিশটি গল্প বলেছিল এবং প্রতিটি গল্পের শেষে একটি করে প্রশ্নও করেছিল। আর মহারাজ বিক্রমাদিত্য বেতালের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তরও দিয়েছিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য মৌন থেকেই তার যথাযথ উত্তর ইসারা করে জানিয়েছিলেন বেতালকে। এমনিভাবেই রাত্রি প্রায় ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বেতালের পঁচিশটি গল্প শেষ হয়ে গিয়েছিল। বেতাল মহারাজের কাছ থেকে তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছিল। এই কারণেই কাপালিকের হাত হতে

রাজা বিক্রমাদিত্যকে বাঁচাবার জন্য তার গুপ্ত অভি-সন্ধির কথা বলে দিল।

'মহারাজ আপনি কি জানেন না—নরবলি না দিলে কাপালিকের সিদ্ধিলাভ হয় না; ওই ভণ্ড কাপালিক আপনাকে মা কালীর কাছে বলি দিয়ে অষ্টসিদ্ধি লাভ করতে চায়!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ রাজা বিক্রমাদিত্য—তবে এর হাত হতে বাঁচ-বার কৌশল আমি আপনাকে জানিয়ে দেব। আপনি আমার কথামতো কাজ করলে প্রাণে তো বাঁচবেনই আর আমাকেও আপনি চিরকাল আপনার ভৃত্যরূপে পাবেন।'

'তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ বেতাল। এখন কি আমাকে করতে হবে তাই বল।'

বেতাল মহারাজের কথায় ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর প্রাণ বাঁচানোর কৌশল বলে দিল: 'মহা-রাজ, কাপালিক যখন আপনাকে শুয়ে পড়ে মা কালীকে প্রণাম করতে বলবে, তখন আপনি বলবেন কেমনভাবে প্রণাম করতে হবে তা যদি কাপালিক দেখিয়ে দেয় তবে বড়ই ভালো হয়!'

'আমি তাই বলবো বেতাল!'

রাজা বিক্রমাদিত্য আবার ধন্যবাদ জানালেন তাঁর বেতাল বন্ধুটিকে। কিছু সময় বাদে রাজা বিক্রমাদিত্য তাকে কাঁধে নিয়ে কাপালিকের কাছে এসে পৌঁছলেন। কাপালিক যজ্ঞ সমাপ্ত করে রেখেছিলেন। এখন রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে বললেন তাঁর ইষ্টদেবী মা কালীকে। 'মহারাজ প্রণাম করুন।'

রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালের কথা মতো বললেন: 'আমি রাজা—কেমন করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয় তা তো জানি না। দয়া করে যদি দেখিয়ে দেন, তবে কৃতজ্ঞ হই!'

কাপালিক রাজার কথায় আনন্দিত হয়ে রাজাকে যেমনি শুয়ে পড়ে প্রণাম দেখাতে গেলেন অমনি রাজা বিক্রমাদিত্য মা কালীর হাতের খাঁড়া নিয়ে তাঁকে একে-বারে দু টুকরো করে ফেললেন! আগেই যজ্ঞ সমাপ্ত করা ছিল—এবার নরবলি শেষে রাজা বিক্রমাদিত্য অষ্ট-সিদ্ধি লাভ করলেন। বেতাল এইবার মহারাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'আজ্ঞা করুন মহারাজ, কি করতে হবে? আজ থেকে আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হলাম।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথায় খুশী হয়ে বললেন: 'বেতাল আমি ডাকলেই যেন তোমার সাক্ষাৎ পাই—এইটুকুই আমি তোমার কাছে চাইছি বন্ধু!'

'তাই হবে মহারাজ—আপনি ডাকলেই আপনার কাছে এসে আমি হাজির হবো।'

এই কথা বলেই বেতাল অদৃশ্য হয়ে গেল। মহা-রাজও আনন্দিত চিত্তে তাঁর নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। শোনা যায় মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই বেতাল বন্ধুর দ্বারা অনেক অনেক অসাধ্য কাজ সাধন করেছিলেন এবং বহু অলোকিক গুণেরও তিনি অধিকারী হয়ে-ছিলেন।

এইরূপ এক একটি গল্প বলার সাথে সাথেই বত্রিশ-সিংহাসনের বত্রিশটি পুতুল ভোজরাজার কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গরাজ্যে গমন করেছিল। এরা সকলেই কিন্তু রাজা বিক্রমাদিত্যের শৌর্যের গল্পই বলেছিল ভোজরাজাকে।

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেকটা বাড়ি থেকে হাত সাফাই করেছি, ফন্টেটা এসে ভাগ বসাবার আগেই নিরিবিলি এক জায়গায় বসে এটা সাবাড় করি।
এ নন্টেটা মনে হচ্ছে কি যেন নিয়ে যাচ্ছে— দেখতে হচ্ছে তো।
ঠিক জায়গাতেই এসে দাঁড়িয়েছি। ও এদিকেই আসছে।
আরে- আরে!
তোকে একেবারে ক্যাচ আউট করে দিলুম নন্টে!
ওফ্!
ভালো চাস তো আমার কেক ফিরিয়ে দে বলছি ফন্টে!
হাফা হাফিতে যদি রাজি থাকিস তবে দেবো।
এমন সময়
উঃ! আর তো পারিনা!

তোমার কি হয়েছে বলতো বুড়ো?
তুমি ওরকম করছ কেন?
কদিন কিছু খাওয়া জোটেনি বাবারা! আর চলতে পারছি না।
নন্টে, এই নে তোর কেক। আমি ভাগ চাই না। পেটটা বড্ড কামড়াচ্ছে রে!
আমারও মাইরি! কি করি বলতো? কেকটা তাহলে—
—বুড়োকে দিয়ে দিই। ফেলে তো আর দিতে পারি না।
ঠিক বলেছিস ফন্টে! তাহলে বুড়োকে ডাকি কি বলিস? ও বুড়ো দাঁড়াও!
এই কেকটা তুমি খাও বুড়ো!
বেঁচে থাকো বাবারা! তোমরা আমাকে বাঁচালে!
একটু পরে
আমি যেই বললুম পেট কামড়াচ্ছে অমনি তোরও কামড়াল।
বেশ করেছে কামড়েছে। তোর তাতে কি রে ছুঁচো? পেট কি তোর একলার?
খবদ্দার নন্টে! মুখ সামাল্‌কে!
খবদ্দার ফন্টে! সাবধান!
খবদ্দার!
খবদ্দার!

অরণ্য-জীব যদি লুপ্ত হয় ?

শৈল চক্রবর্তী

তোমরা শিকার করা কাকে বলে জান। শিকারের গল্পও অনেক পড়েছ। কিন্তু আমি যা বলতে যাচ্ছি, তা হল ঐ শিকারের উল্টো কথা।

জব্বলপুরের কয়েক মাইল দক্ষিণে মধ্য প্রদেশের এক বিরাট জঙ্গল। এর নাম কান্‌হা ন্যাশন্যাল পার্ক। এর মধ্যে আছে সমতল মাঠ, আছে পাহাড়, আছে অরণ্য। সব শুদ্ধ জমি একশ বাইশ বর্গ মাইল।

কী পশুপাখি নেই ওখানে! ঘুঘু চরছে মাঠে। ময়ূর পেখম তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও চিতল হরিণ ছুটোছুটি করছে। আবার কোথাও ঘন অরণ্যের গভীরে সোনায় কালোয় ডোরা-ছাপা শতরঞ্জ গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘ। খাঁচায় বন্দী হয়ে কেউ নেই। সবাই স্বাধীন। স্বাভাবিক পরিবেশে তাদের জীবনযাত্রা।

আমরা শুনি, সিংহ বাঘ ভালুক প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুরা মানুষের শত্রু। এরা আমাদের গৃহপালিত জীব-জন্তু ধরে খায়। বিশেষ করে বাঘ যখন ম্যান-ইটার বা নরখাদক হয়, তখন ত সে মানুষের রীতিমত শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। অবস্থা বিপাকে সিংহও মানুষ খেতে ছাড়ে না। মানুষও তাই এদের হত্যা করতে দ্বিধা করে না।

কিন্তু এইসব মাংসাশী জানোয়ার যে সময় সময় আমাদের অপকার করে, তা কি শুধু ওদেরই দোষ? বোধহয় না।

প্রকৃতি সব সময় সব জায়গায় ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। বনে যেমন থাকে মাংসাশী জানোয়ার, তেমনি তাদের খাদ্যের জন্য থাকে হরিণ, সজারু, বরা, খরগোশ প্রভৃতি নিরামিষাশী জন্তু।

ওরা অর্থাৎ ঐ নিরামিষাশী ও মাংসাশী কোন পক্ষই কিন্তু সহজে লোকালয়ে আসে না বা আসতে চায় না। দু-পেয়ে এই মানুষ জীবটাকে ওরা বেশ সমীহ করে, সর্বদা এড়িয়ে চলতে চায়। মানুষ অবশ্য দেহের শক্তিতে ওদের অনেকের সঙ্গেই পারে না। কিন্তু তার বুদ্ধি ও অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষতঃ তার আবিষ্কার ঐ যে সব আধুনিক মারণাস্ত্র, ওটিকে হিংস্রতম জন্তুও ভয় করে।

এখন, মানুষের অবিবেচনার ফলে বনজঙ্গল যদি নষ্ট হয়, বা তার হিংস্রতার ফলে বনে যদি এক পক্ষের অভাব ঘটে, তাহলেই অপর পক্ষ লোকালয়ে আসতে বাধ্য হয়, মানুষের কাছে তারা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

ধরো, মানুষের বেপরোয়া শিকারের ফলে বনে নিরামিষাশী জন্তুদের অভাব ঘটল। মাংসাশী জানোয়াররা তখন কি করবে? পেটের জ্বালায় তখন তারা লোকালয়ে হানা দিতে বাধ্য হয়। তেমনি মনে কর, বনের মাংসাশী জানোয়ারদের আমরা মেরে উজাড় করে দিলাম, নিরামিষাশীদের খাওয়ার কেউ থাকল না। তখন তাদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে, খাদ্যের জন্য তারা মানুষের ফসলের ক্ষেতে হানা দিতে শুরু করল।

তাই বলছিলাম, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হলেই ঘটে যত গণ্ডগোল।

শিকার করা মানুষের একটা আদিম কালের শখ। এতে সাহস চাই, বুদ্ধিও লাগে। শিকার করার মধ্যে আছে আনন্দ ও উত্তেজনা। কিন্তু শিকার করতে করতে মানুষ যদি সব বাঘকে মেরে ফেলে? সব সিংহ গণ্ডার যদি নিহত হয়? তখন? তখন আমরা নিশ্চিন্ত, কেমন?

কিন্তু তাই কি? তখন আর ত শিকার করা চলবে না! শিকারযোগ্য জীব না থাকলে কাকে শিকার করবে? শুধু কি তাই? প্রকৃতির সৃষ্ট ঐ বিচিত্র জীবকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে কতখানি ক্ষতি হবে দেশের, একটু ভেবেছ কি? তোমরা চিড়িয়াখানায় গিয়েও ওদের আর দেখতে পাবে না। একমাত্র ছবিতে থাকবে ওরা, বইয়ের পাতায় অতীতের বস্তু হয়ে—যেমন দশা হয়েছে আরও অনেক জীবের যারা একেবারে বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে। তাদের আর আমরা দেখতে পাব না। দাঁতালো বাঘ অনেক দিন আগে ছিল, যেমন ছিল মাস্টোডন হাতি। ডোডো পাখি, প্লাটিপাস, এমনি আরও কত জীব আর কোনোদিন দেখা যাবে না।

আমাদের ভারতবর্ষের কয়েকটি জঙ্গলে বাঘ তবু পাওয়া যায়। কিন্তু সিংহ আছে একমাত্র গুজরাটে গির অরণ্যে। এখানে মাত্র তিনশোর মত সিংহ আছে। সরকারী আদেশে তাদের শিকার নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ না হলে দুম্ দাম্ গুলির আঘাতে সিংহবংশ এত দিনে লোপাট হয়ে যেত। আর গণ্ডারও কিন্তু আমাদের দেশে খুব বেশী নেই। সব শুদ্ধ চার থেকে পাঁচশোর মত গণ্ডার আছে এ দেশে।

অবস্থা কতখানি নৈরাশ্যজনক, আশা করি বুঝতে পারছ। কুড়ি বছর আগেও যে সব আরণ্য জীব ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যেত, সে সব জীব এখন প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কান্হা পার্কে পাঁচ বছর আগে পাঁচশোর বেশি সুঠাম জলা-হরিণ বাস করত। আজ সেখানে পঞ্চাশ ষাটটির মত রয়েছে। নব্বুইটি শিং-ওয়ালা এন্টিলোপ কমে কমে ষোলটিতে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য ঐ পার্কে শিকার একেবারে নিষিদ্ধ।

প্রকৃতির নির্জন জলাভূমিতে, প্রান্তরে, অরণ্যে নানা কারণে জীব-জন্তুর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। তারা বাস করার মত পরিবেশ পাচ্ছে না। মানুষ হানা দিচ্ছে না কোথায়? আমরা আমাদের সভ্যতার বিজয়নিশান তুলছি সর্বত্র। বন জঙ্গল কেটে সাফ করছি, কেন না আমাদের চাষের জমি চাই, বাসের ঘর চাই, মাল তৈরির কারখানা চাই। মাঠ হোক, জঙ্গল হোক আর পাহাড়ই হোক, সর্বত্র অবাধ গতি আমাদের। যে সব অঞ্চল বন্য জন্তুর ভয়ে আগে মানুষের অগম্য ছিল, এখন সে সব অঞ্চলে আমরা দলে দলে গিয়ে সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র হাতে শিকারীর সাজসজ্জায় সেজে বন্যজন্তু বধ করছি। তাই, আমাদের দেশে প্রকৃতির অনেক জীব-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতে চলেছি আমরা।

অনেক দিন আগে সম্রাট অশোক এই আশঙ্কাতেই বোধহয় নির্বিচারে বন্যজন্তু বধ করার বিরুদ্ধে সাবধান বাণী দিয়েছিলেন। তাঁর উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এই কথা পাওয়া যায়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুও এক-সময় বলেছিলেন, আমাদের যেটুকু বন্য সম্পদ আছে, তা সর্ব প্রযত্নে রক্ষা করতে হবে।

কেউ কেউ হয়ত বলবে, কি দরকার? বন কেটে পরিষ্কার করে নগর তৈরী হলে ত ভালই। জঙ্গলের বিভীষিকা আর থাকবে না।

কথাটা সত্যি। কিন্তু পুরোপুরিই কি সত্যি? ভেবে দেখ ত। দেশময় যদি শুধু নগর আর নগর, জনপদ আর জনপদ গড়ে ওঠে, সেটা কি ভাল হবে?

পাহাড়গুলো আমাদের কম কাজে লাগে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে কি, দেশের পাহাড়পর্বতগুলো ভূমিসাৎ করার যুক্তি দেবে? পাহাড়কে ফুটো করে তার মধ্যে দিয়ে যখন আমাদের রেলগাড়ি ছোটে, সেই অন্ধকার-টুকু গাড়িতে বসে পার হতে বেশ লাগে। যতই দুরারোহ হোক, পর্বত-আরোহণের আনন্দ কি কম? তেমনি প্রাকৃতিক অরণ্যের শোভাও কি কম?

আমাদের এই শহর কলকাতায় আলিপুরে যে চিড়িয়াখানা আছে, সেখানে আমরা জানি একদিনে এক লক্ষ পর্যন্ত দর্শনার্থীর ভিড় হয়। বিশ-পঁচিশ হাজার লোক ত প্রায়ই যায় ওখানে। এত লোক যায় কেন? কিসের আকর্ষণে এত ভিড় হয়? মার্কিন দেশে পড়েছি, বছরে আট কোটির বেশী লোক জু ও ন্যাশন্যাল পার্কে বেড়াতে যায়।

কেন যায় এত লোক এই সব জায়গায়? প্রশ্নটা কিন্তু গুরুতর। এক কথায় তার জবাব হল, আমাদের ভাল লাগে তাই যাই। এই ভাল লাগাটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ, মানবিক গুণের লক্ষণ। শহরের ইট কাঠ সিমেন্ট পীচের একঘেয়েমি থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পাবার জন্য যাই। এমন দেশ আছে যেমন কেনিয়া, যেখানকার সরকার নাকি বিদেশী পর্যটক ও শিকার-প্রিয় লোক-দের কাছ থেকে এত টাকা লাভ করে, যা তাদের একটা বিরাট আয়। আমাদের দেশেও প্রাকৃতিক সম্পদ এত আছে, যাকে আমরা বিরাট আকর্ষণের বস্তু করে তুলতে পারি।

জীববিজ্ঞানী ডঃ স্কালার তাই বলেন, শিকার করে জীবজন্তু ধ্বংস করা মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু অরণ্যচারী জীবগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত শক্ত।

ডঃ স্কালার একটি ল্যান্ডরোভার গাড়ি নিয়ে প্রায়ই বাঘের কাছাকাছি এগিয়ে যান। গাড়ি দেখলে বাঘ-সিংহ অতটা ভয় পায় না, যতটা পায় বন্দুক হাতে মানুষ দেখলে। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরবীন, বাইনোকুলার, ক্যামেরা ও কাগজপত্র নিয়ে ঐ সব হিংস্র জীব কিংবা নিভৃতচারী হরিণযূথের তথ্য সংগ্রহ করেন।

তিনি বলেন, শিক্ষণীয় আর মজার মজার জিনিস আমি জানতে পাই ওদের লক্ষ্য করে। একদিন দেখি, কয়েকটা বাঘ একটা বাইসনকে মেরে ভোজ লাগিয়েছে। মহাখুশিতে সেদিন দেখলাম, জঙ্গলে স্বাভাবিক অবস্থায় ওরা কিভাবে খায়। পেট ভরলে শিকার-করা খাদ্যকে কেমন করে রেখে চলে যায় পরে খাবে বলে। দলের মধ্যে কজন থাকে, শিকার ধরে কে এবং কারা—এসবও লক্ষ্য করার জিনিস। হরিণের দল যখন আসে, তাদের মধ্যে কটা পুরুষ কটা মেয়ে। তারা দাঁড়ায় কেমন করে, তারপর মাংসাশী বড় জানোয়ারের গন্ধ মাত্র পেতেই ত্বরিৎগতিতে তারা কেমন ভাবে আত্মরক্ষা করে,—এই সব তথ্য শুধু প্রাণীবিদের কাছে নয়, আমাদের কাছেও কি কম মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক? ক্যামেরায় লেন্স্ দিয়ে বিজ্ঞানীকে এসব ধরে রাখতে হয়, নোট লিখতে হয় সঙ্গে সঙ্গে। তবেই ত ঐসব প্রাণীর জীবন যাপন সম্বন্ধে বিচিত্র সব ঘটনা জানতে পারি আমরা। জানতে পারি, খাদ্য-জীবের অভাব হলে কেমন করে মাংসাশীদের সংখ্যা কমতে থাকে।

এই কাজ করতে গিয়ে বিপদের সম্ভাবনা যে থাকে না তা নয়। পর্যবেক্ষণের জন্য যতটা সম্ভব ওদের কাছে যেতে হয়, তবু নিরাপদ দূরত্ব রাখতেই হয়। জন্তুরাও সেই দূরত্ব রেখে চলে, তারা কিছুতেই এত কাছে আসে না যেখান থেকে তারা এক ছুটে পালাতে পারবে না।

ডঃ স্কালার বলেন, আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়েই যাই অবশ্য। মারণাস্ত্র কাছে রাখি না। সঙ্গে বন্দুক থাকলেই মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা থাকবে, যেটা নাকি দূর থেকে বাঘ-সিংহ-বাইসন কেমন করে যেন ধরতে পারে। তখন তারাও বিজাতীয় শত্রু বোধে হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে।

আফ্রিকায় যাঁরা সিংহের আস্তানার কাছে যান বিচরণশীল সিংহের ছবি তুলতে, তাঁদের অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। কত লোক বিপদেও পড়েছেন। কিন্তু কৌতূহলী মানুষ তবু কি ভয় পেয়ে কাজ থেকে পেছিয়ে এসেছে? ক্যামেরা ও টেলিফোটো লেন্স্ নিয়ে বনে বনে হয়ত দিনের পর দিন ঘুরে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কেউ একটি অরণ্যবিহারী লাজুক পাখি ও তার শাবক-দের ছবি তুলে এনেছেন। কেউ বা অরণ্যের গভীরে হিংস্র জন্তুকে ধরে এনেছেন ক্যামেরায়। আর তাইতেই তাঁদের কত আনন্দ!

জলে স্থলে পর্বতে শূন্যে মানুষের আজ অবাধ আধিপত্য। আরণ্য জীবের হিংসার সঙ্গে যুদ্ধ করে সে বহুদিন হল নিজেকে নিরাপদ ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন কি মানুষ চাইবে ঐ সব জীবনের বৈচিত্র্য অবলুপ্ত হয়ে যাক? তখন কি ওদের অস্থি-কঙ্কাল মাত্র সংগ্রহ করে আমরা যাদুঘরে সাজিয়ে রাখব?

এর একমাত্র উত্তর হল 'না'।

পাহাড়ের নাম করালী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

॥ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ॥

পরের দিন বেলা দুপুর পর্যন্ত বঙ্কুবাবু যখন ফিরলেন না, তখন রীতিমত অস্থির হয়ে উঠলাম। আমার ভয়টা শুধু নিজের মনের মধ্যেই আর চেপে রাখতেও পারলাম না।

নিজেই একবার বঙ্কুবাবুর খোঁজ করতে যেতে পারতাম। সে কথা একবার ভেবেওছিলাম। কিন্তু তারপরই মনে হল ব্যাপারটা সম্ভবতঃ অনেক বেশী গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু আমার নিজের ক্ষমতার ওপর ভরসা করে একলা কিছু করতে যাওয়া উচিত নয়।

মামাবাবু কিংবা তাঁর বদলে মহান্তীকে আগের দিন যা যা ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়ে আমার অনুমান আর আশঙ্কাটা জানান দরকার বুঝেও বেশ একটু অনিচ্ছার সঙ্গে বুঝেই অবশ্য তাঁদের খোঁজে গিয়েছি।

মামাবাবু কি ভাবে ব্যাপারটা নেবেন সেটা খানিকটা অনুমান করতে পারি বলেই এই অনিচ্ছা। এত বড় গুরুতর ব্যাপারটাকে সম্ভবতঃ তিনি আমলই দেবেন না।

বঙ্কুবাবু নিরুদ্দেশ!—বলে মিথ্যে আতঙ্কের ভান করে হয়ত শেষ পর্যন্ত হেসেই উঠে বলবেন,—খ্যাঁটের লোভে আদিবাসীদের গ্রামেই হয়ত লুকিয়ে আছে! মহান্তী কাছে থাকলে তাঁরও সে পরিহাসে যোগ দেওয়াটা বেশ কল্পনা করতে পারি।

সত্যি কথা বলতে গেলে বঙ্কুবাবুকে নিয়ে এ রকম অস্থির হওয়াটা একটু যে হাস্যকর দেখায় তা আমিও বুঝি। সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক মত না জানলে তাঁকে নিয়ে দুর্ভাবনাটা আজগুবি মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

ভালো করে সমস্ত ঘটনাটা তাই মামাবাবুকে না বোঝালে নয়। কিন্তু সে সুযোগ আর সময় মামাবাবু দেবেন কি! আগের বারের মতই হয়ত কটা কুড়োনো কাগজের মত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মেতে আমার কথা সব উল্টো বুঝবেন।

এবার আমি অবশ্য নাছোড়বান্দা হব বলেই পণ করেছি। যেমন করে হোক আমার বক্তব্যটা তাঁকে যদি নাও পারি মহান্তীকে শোনাবই।

তার পরেও যদি তাঁরা নির্বিকার থাকেন ত নাচার।

কিন্তু মামাবাবু বা মহান্তীর নাগাল পাওয়াই যে ভার।

তাঁরা লোধমা পাহাড় ছেড়ে যান নি এইটুকু খবর পেয়ে আমাদের নিজেদের ছাউনি, তারপর সরকার সাহেবের আস্তানা দুজায়গায় খোঁজ করে শেষে যা জানলাম তাতে বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ করলাম। আর কোথাও নয়, নাগাপ্পার খাস তাঁবুতেই তাঁরা বিশেষ পরামর্শ-সভায় নাকি জড় হয়েছেন।

নাগাপ্পার তাঁবু শুনেই অবশ্য সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। আমার যা বলবার তার শ্রোতা হিসেবে নাগাপ্পাকে যে চাই না তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এখন আর উপায় কি! সময় আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। নাগাপ্পার তাঁবুর পরামর্শ-সভা থেকে কখন মামাবাবু বার হবেন তার জন্যে আর অপেক্ষা করা চলে না।

মরিয়া হয়ে নাগাপ্পার তাঁবুতেই তাই গিয়ে হানা দিলাম।

পরামর্শ-সভাটা যে অত্যন্ত গোপন ও জরুরী তা নাগাপ্পার বেয়ারার আচরণেই একটু বোঝা গেল। সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়েও সে একটু দরজা আটকাবার ভঙ্গিতেই বললে,—ওঁদের জরুরী মিটিং হচ্ছে আজ্ঞে! কারুর ঢুকতে মানা আছে।

জানি!—বলে বেয়ারাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে পর্দার দরজা ঠেলে নাগাপ্পার খাস তাঁবুতে ঢুকে পড়লাম।

ঢোকাটা যে অপ্রত্যাশিত আর অবাঞ্ছিত তা কয়েক জোড়া অপ্রসন্ন চোখের কোঁচকানো ভুরু দেখেই বুঝলাম; মহান্তীর তাকানটাও একটু যেন অস্বস্তির। শুধু মামাবাবুর দৃষ্টি নির্বিকার আর সহাস্য অভ্যর্থনা শুধু নাগাপ্পার মুখে।

আসুন! আসুন মিঃ হাজরা!—তাঁর নিজের তাঁবুতে সভা বসেছে বলেই যেন উদার গৃহস্বামীর ভূমিকা নিয়ে নাগাপ্পা বেয়ারাকে একটা বাড়তি চেয়ার আনবার হুকুম দিলেন।

আমি ইতিমধ্যে কামরার সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। শুধু মামাবাবু, মহান্তী, সরকার সাহেব আর নাগাপ্পা নয়, আর একটি নতুন মুখ সেখানে দেখলাম। আমাদেরই বয়সী রোগাটে একজন ইউরোপীয়ান। ফিকে বাদামী পাতলা চুল আর ফ্যাকাশে কোঁচকানো মুখে কেমন একটু রুগ্নতার আভাস থাকলেও ইনিই যে নাগাপ্পার বর্তমান অতিথি মহাবুরাং-এর হাতি শিকারী তা তখন বুঝেছি।

বেয়ারার নিয়ে আসা ক্যানভাসের ফোল্ডিং চেয়ারটায় বসবার পর নাগাপ্পা পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় ইয়োরোপীয় শিকারীর নামটাও জানলাম—জন কার্সন।

এ সভার আলোচনার বেশ একটা উত্তেজনার মুহূর্তে উপদ্রবের মত যে এসে পড়েছি পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হবার আগেই বুঝলাম।

সরকার সাহেবই একটু অধৈর্যের সঙ্গে নাগাপ্পার দিকে চেয়ে বললেন, এসব লৌকিকতার যথেষ্ট সময় পরে পাওয়া যাবে মিঃ নাগাপ্পা। এখন মিঃ সেন যা বলছিলেন সেটার মীমাংসা আগে দরকার।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই!—বলে নাগাপ্পা যেন মাপ চাইবার ভঙ্গি করলেন। কিন্তু তাঁর চোখের মধ্যে এক পলকের জন্যে যে চাপা আক্রোশের ঝিলিকটা খেলে গেল তা আর যারই হোক আমার দৃষ্টি এড়াল না।

মামাবাবু কিন্তু আগাগোড়া নির্বিকার। আমরা চুপ করতেই বই থেকে যেন মুখস্থ পড়ছেন এমনি ভাবে বললেন,—আমরা তাহলে দু ধরণের অদ্ভুত খেই এ রহস্যের পাচ্ছি। তার একটা এই খুনের ব্যাপারের সঙ্গে জড়ানো কিনা তাও আমরা কেউ জোর করে এখনো বলতে পারছি না। এ খেই কটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো বলা যেতে পারে। মিঃ সরকারই প্রথম এগুলো দৈবাৎ লক্ষ্য করেন। এ কাগজগুলোর ভেতর সাংঘাতিক কিছু লেখা টেখা পাওয়া যায় নি। যা দেখা গেছে তা পড়লে আজে বাজে কথা কেউ অন্যমনস্ক ভাবে এখানে সেখানে লিখেছে বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু মন দিয়ে পরীক্ষা করলে সন্দেহ হয় কথাগুলো একেবারে আবোল তাবোল নয়। যেমন এই কাগজের টুকরোটাই দেখা যাক।

সামনের টেবিলটার ওপর একটি ছোট খোলা বাক্সের মধ্যে রাখা ছেঁড়া দলা-পাকানো টুকরো কাগজগুলো আগেই চোখে পড়েছিল। মামাবাবু তা থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে খুলে ধরে বললেন,—এতে লেখা দেখছি, ইংরেজিতে 'সি. আর., ২৪নং ৫২,০১' তারপর নিচে এক জায়গায় বোলতার চাকের মত একটা ছবি আঁকা।

মামাবাবু ছবিটা আমাদের দেখিয়ে বললেন,—সব শুদ্ধ জড়িয়ে অর্থহীন খামখেয়ালী লেখা আর আঁকা বলে মনে হলেও এগুলির একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই আরেকটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো দেখলেই সে তাৎপর্যটা কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে। এ কাগজটার

লেখা দেখছি—'মেটাল বুলেটিন, ১৯৩৮, ৭৮নং আউন্স ৩৬ ডলার'।

এ লেখার 'মেটাল বুলেটিন ১৯৩৮'-এর মধ্যে ধোঁয়াটে কিছু নেই। তার পরের '৭৮নং আর আউন্স ৩৬ ডলার'-এরও একটু ভাবলেই মানে পাওয়া যায়। ৭৮নং

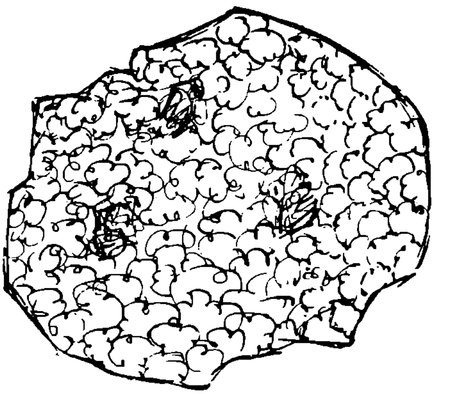

বোলতার চাকের মতো একটা ছবি

কি? সেটা হল প্ল্যাটিনম্ ধাতুর অ্যাটমিক নম্বর। অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের বিলেতের মেটাল বুলেটিন থেকে প্ল্যাটিনম ধাতুর দর যে আউন্স পিছু ৩৬ ডলার তা টুকে রাখা হয়েছে। এই কাগজের টুকরোর পাঠোদ্ধারের পর আগেরটাও বুঝতে অসুবিধে হয় না। সি. আর. হ'ল ক্রোমিয়ম ধাতুর সিম্বল, তার অ্যাটমিক নম্বর হল চব্বিশ, আর অ্যাটমিক ওজন হল ৫২·০১। কিন্তু এ সবের সঙ্গে ওই বোলতার চাকের মত ছবিটা কেন আর কিসের?

ছবিটা ক্রোমিয়ম ও প্ল্যাটিনম যার মধ্যে পাওয়া যায়, নাম না করে সেই পাথরটা বোঝাবার জন্যে। ও পাথরের বৈজ্ঞানিক নাম হল পেরিডোটাইট। পৃথিবীর গভীর বুকে প্রচন্ড উত্তাপ আর চাপে তৈরী হয়। রং খুব গাঢ় সবুজ বা কালো।

হেলাফেলার বলে যা মনে হয়েছে, তাঁর কুড়িয়ে আনা সেই ছেঁড়া কাগজের মধ্যে এত রহস্য পাওয়াটা যেন তাঁরই বাহাদুরী মনে করে সরকার সাহেব তখন উত্তেজিত। মামাবাবু একটু থামতেই তাঁকে আবার উসকে দিয়ে বললেন,—এসব কাগজে যা পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে তাহলে কি বোঝা উচিত?

মামাবাবু যে ভাবে হাসলেন, তাতে সরকার সাহেবের এ উৎসাহে তিনি খুশি হয়েছেন বলেই মনে হল। হেসে তিনি বললেন,—বোঝা উচিত যে এখানে কেউ পেরিডোটাইট আর তার মধ্যে ক্রোমিয়ম ত বটেই এমন কি প্ল্যাটিনমেরও সন্ধান বোধহয় পেয়েছে।

পাওয়াটা ত অপরাধ নয়!—নিজের কথাটা বলবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেও মামাবাবুদের এই নিরর্থক আলোচনায় ও মন্তব্যটুকু না করে পারলাম না।

পাওয়া অপরাধ নয়,—মামাবাবুর বদলে মহান্তীই হেসে জবাব দিলেন,—কিন্তু লুকিয়ে রাখাটা অপরাধ! এসব কাগজ দেখে মনে হয় কেউ এই রকম কিছু দামী খনিজের সন্ধান পেয়ে তা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে।

তাতে লাভ? অবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম,—খনি ত আর চুরি করে পকেটে নিয়ে পালান যাবে না!

তা যাবে না! নাগাপ্পাই এবার আমাকে জ্ঞান দিলেন,—কিন্তু লুকিয়ে কিছু হাতিয়ে নিতে পারলে প্ল্যাটিনম-এর মত ধাতু বেচে বেশ কিছু লাভ করা যায়। তাছাড়া সরকারের কাছে যে সব কোম্পানী এসব খনি চালাবার অধিকার নেয় তাদের কাছ থেকেও গোপন খবর দেবার দরুন মোটা টাকা আদায় করা যেতে পারে।

শুধু তাই কেন!—মামাবাবুই বুঝিয়ে দিলেন এবার,—সেরকম ঠগ কোম্পানী হলে অন্য কিছুর নামে খনি চালিয়ে গোপনে এই দামী ধাতু পাচার করতে পারে। বেশী দিন তা পারা না গেলেও সেরকম চোরা দলের পক্ষে কিছুদিনের মধ্যেই যতখানি সম্ভব লুটে পুটে নিয়ে একেবারে হাওয়া হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু লোধমা পাহাড়ে যারা আছে,—নাগাপ্পা এবার একটু তীব্র স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন,—তাদের মধ্যে এ কাজ কারুর পক্ষে সম্ভব বলে ত ভাবতে পারছি না।

কয়েক মুহূর্ত সবাই একেবারে চুপ। মনের কথা কারুর যদি কিছু থাকে বলার দ্বিধা কেউ যেন কাটাতে পারছেন না।

দ্বিধা কাটালেন প্রথম সরকার সাহেব।

টেবিলের ওপর নাগাপ্পার কোম্পানীর একটা ছাপানো প্যাড পড়ে ছিল। তা থেকে হঠাৎ একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে নাগাপ্পাকে যেন চোখের দৃষ্টিতে গেঁথে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন,—এ প্যাড ত আপনার কোম্পানীর?

প্রশ্নটা আমাদেরও অর্থহীন বলে মনে হ'ল। কিন্তু নাগাপ্পা যেন তা'তে জ্বলে উঠে কোন রকমে নিজেকে সামলে তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বললেন,—আপনি ত পড়তে জানেন। নামটা যখন ছাপাই আছে ওপরে তখন জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

জিজ্ঞাসা করছি এই কাগজটার জন্যে!—সরকার

সাহেব আমাদের সকলকে কাগজটা দেখিয়ে বললেন,—আপনাদের কোম্পানীর কাগজ যেমন তেমন নয়, একটু বিশেষ ও উঁচু দরের কাগজ। আমি যত দূর জানি এ রকম কাগজের প্যাড লোধমা পাহাড়ে আর কেউ আমরা ব্যবহার করি না।

তাতে হ'ল কি?—নাগাপ্পার গলা এবার শান্ত। কিন্তু চোখ দুটো যেন ছুরির ফলা।

হয়েছে এই যে, এসব ছেঁড়া টুকরো আর আপনার প্যাডের কাগজ একই ব্র্যান্ডের। আপনারা মিলিয়ে দেখুন।

সরকার সাহেব ছেঁড়া কাগজের বাক্স আর প্যাডটা টেবিলের মাঝখানে ঠেলে দিলেন।

কেউ কিন্তু সঙ্কোচের দরুনই বোধহয় কাগজগুলো মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করল না।

নাগাপ্পাই সেগুলো নিজের কাছে টেনে নিয়ে হেসে উঠে বললেন,—তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আমার এ প্যাড টেবিলের ওপর অফিস ঘরে পড়ে থাকে। যে কেউ তা চুরি করতে পারে।

তা হয়ত পারে।—সরকার সাহেব বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বললেন,—কিন্তু আপনি যে কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে এখানে আছেন, তার কাজটা কি বলতে পারেন? কোম্পানীটা আসল না জাল তাই ত বোঝা যাচ্ছে না। আমি ত বড় বড় সব কটা ডিরেকটরী ঘেঁটে কোথাও আপনাদের কোম্পানীর নাম পাই নি।

ঘরের সবাই স্তম্ভিত বলে মনে হল। নাগাপ্পা কিন্তু এবার অবিচলিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি এত কষ্ট তাহলে করেছেন? কেন মিছে করতে গেলেন! তার বদলে আমায় জিজ্ঞাসা করলেই আমি বলে দিতাম আমাদের কোম্পানীর নামটা আসল নয়।

—ক্রমশঃ

টুকরো আবিষ্কার

—সুনীল সরকার

পরিষ্কারক তরল পদার্থ

তৈলবাহী ট্যাংকারে লেগে থাকা তেল পরিষ্কার করা একটা সমস্যা। সাবান, সোডা গোলা জলেও এই ট্যাংক পরিষ্কার করা যায় না। যায় না অনেক সময় ভিতরে লোক নামিয়ে ঘষে পরিষ্কার করা। ফলে এই ট্যাংকগুলো অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা তো যেতই না, উপরন্তু অকেজো হয়ে পড়ে থাকত। অথচ এই মজবুত ট্যাংক বা ড্রামগুলো অন্য কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার কয়েকজন রসায়ন-বিজ্ঞানী এই ট্যাংকগুলো পরিষ্কার করার জন্যে এম. এল.-৬ নামে একটি তরল পদার্থ আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে তৈলবাহী ট্যাংকারে লেগে থাকা তেল আর চর্বির তলানি পরিষ্কার করা যায়। এর সাহায্যে পরিষ্কার করার পর চিনি, শস্য অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী পরিবহণের জন্যে ওইসব ট্যাংক ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়—এই পরিষ্কারক পদার্থটি এমনি যে, ঐ তৈলাবশেষটাও ব্যবহার করা চলে। আগে সেটা সমুদ্রে ফেলে দিতে হত এবং তার ফলে জলও দূষিত হত।

চুল ছাঁটার যন্ত্র

আমাদের দেশে চুল ছাঁটতে সেলুনে যেতে হয়। কাঁচির সাহায্যে চুল কাটাতে নানা রকম ত্রুটীবিচ্যুতি থেকে যায় এবং আমরাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হতে পারি না। কিন্তু যদি একটি চুল কাটার যন্ত্র থাকত যা মাথায় বসিয়ে দিলে নিখুঁতভাবে পছন্দসই চুল কেটে দেবে তা হলে কি মজাই না হত?

তোমরা শুনলে বিস্ময় প্রকাশ করবে যে, বিদেশে চুল-দাড়ি কাটার জন্যে আজকাল নানা প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এ সকল যন্ত্র বড় বড় সেলুন ছাড়া অনেকের বাড়ীতেও দেখতে পাওয়া যায়। রাশিয়া বা আমেরিকার মেয়েরাও সেলুনে গিয়ে চুল ছাঁটে এবং চুলের বাহারের জন্য যন্ত্র ব্যবহার করে। আজকাল চুল ছাঁটার জন্যে এমন সব যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে, যা পছন্দ অনুযায়ী নিখুঁত চুল কাটায় অদ্বিতীয়। এই সব যন্ত্র বিদ্যুতের সাহায্যে পরিচালিত।

ঘুমের জন্যে

নির্মলেন্দু গৌতম

ঘুমোবার আগে যদি চোখের সামনে একখানা বই খুলে না ধরেন তাহলে বিপিনবাবুর চোখে ঘুম আসে না। অভ্যেসটা যে কেমন করে তৈরী হয়েছে, বিপিনবাবু তা জানেন না। কবে থেকে তৈরী হয়েছে তাও মনে করে বলতে পারবেন না বিপিনবাবু। শুধু জানেন, বালিশের তলায় রোজ একখানা বই থাকবেই। আর শুয়ে সে বইখানা বালিশের তলা থেকে বের করে চোখের সামনে খুলে ধরতেই হবে তাঁর।

এতে ভুল হবার যো নেই। ভুল হলে তিনি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবেন। তখন তাঁকে থামাবে কার সাধ্যি! কাজেই সন্ধ্যেবেলা থেকেই সবার খবর নেয়া শুরু হয়, বিপিনবাবুর বালিশের তলায় একখানা বই আছে কিনা!

যেমন তেমন একখানা বই হলেই হলো বিপিন-বাবুর। বার কয়েক পড়া বই হলেও ক্ষতি নেই। দু এক লাইন পড়তে পড়তেই তো চোখ জড়িয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে পাশে সরিয়ে রাখেন বইখানা। তারপর হাতে তুড়ি বাজিয়ে বড়ো করে গোটা কয়েক হাই তুলে চোখ বন্ধ করেন। তখন কোথায় বই, আর কোথায় সে বই পড়া! মৃদু স্বরে নাক ডাকা শুরু হয়ে যায় চোখ বুজতে বুজতেই।

কোনো কোনোদিন বই না থাকলে ছোট ছেলের জিওমেট্রি বইখানাই বিপিনবাবুর বালিশের তলায় রাখা হয়। শুয়ে নিশ্চিন্ত মনেই বিপিনবাবু বইখানা চোখের সামনে খুলে ধরেন। কোনো অসুবিধেই হয় না তাতে। 'ত্রিভুজের তিনটি বাহুর সমষ্টি এক সমকোণ' পড়তে পড়তেই তো ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যান।

এ অভ্যেসটার জন্য একদিন দারুণ বিপদে পড়বেন তিনি, বিপিনবাবু তা ভালো করেই জানেন। তবু ছাড়তে পারেন না অভ্যেসটা। ছাড়বেন কি করে, তাহলে ঘুমকেও ছাড়তে হয় যে!

সত্যি সত্যি সেদিন কিন্তু বিপিনবাবু হঠাৎ বিপদে পড়ে গেলেন।

হঠাৎ কোলকাতার বাইরে আসতে হলো বিপিন-বাবুকে। কাজের তাড়া, না এসে উপায়ও নেই। তাড়া-তাড়ি সব গুছিয়ে-টুছিয়ে ট্রেনে করে বিকেলে এসে পৌঁছুলেন তিনি।

যে শহরে এলেন সেখানে দু চারজন চেনা-জানা আছে। কিন্তু সে সব জায়গায় উঠলেন না বিপিন-বাবু। হোটেলেই উঠলেন। এখানে সেখানে ছুটো-ছুটি করে কাজ করতে হবে। স্নান খাওয়ার সময়ও

ঠিক থাকবে না। কাজেই হোটেলে ওঠাই ভালো।

ছোট মতো একটা হোটেলে উঠে তিনি একা একটা ঘর নিলেন। দু তিন জনের ঘরে থাকতে ভারী খারাপ লাগে তাঁর। তা ছাড়া রাত্রে বই পড়বার সময় আলো জ্বালালে অসুবিধেও হতে পারে আর সবার। আর বই না খুললে বিপিনবাবুরও যে কোনো উপায় নেই।

জিনিসপত্র গুছিয়ে বাথরুমে এসে ভালো করে স্নান সেরে নিলেন তিনি। তারপর একটু সময় বেড়িয়ে এলেন রাস্তা দিয়ে। একা একা হোটেলে বসে থাকতে কতক্ষণ আর ভালো লাগে? চেনা-জানা দু একজনের সঙ্গে দেখাও হলো পথে বেরিয়ে। গল্প করতে করতে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলেন তিনি।

একটু রাত হতেই ফিরে এলেন হোটেলে।

ছোট্ট শহর, চারদিক চুপচাপ হয়ে গেল একটু রাত হতেই। বিপিনবাবু ঘরে বসে বেশ কিছু সময় তাস খেললেন একা একাই। তারপর খাবার জন্য বেরিয়েই দেখলেন হোটেলে যারা থাকে সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। যে যার মতো শুয়েও পড়েছে দরজা বন্ধ করে। খুব মনোযোগের সঙ্গে তাস খেলছিলেন বলে ঠাকুর তাঁকে ডাকেনি খাবার জন্য। কাজেই একা একাই খেতে হলো বিপিনবাবুকে। হোটেলের ম্যানেজারও খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়েছে। বিপিনবাবু দেখলেন, ঠাকুর চাকররাও হাই তুলছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে এসে একটু সময় বিশ্রাম করলেন বিপিনবাবু। চারদিক নিঃঝুম হয়ে গেছে। ঠাকুর চাকরদেরও গলা আর শোনা যাচ্ছে না।

বিছানা আগেই পেতে রেখেছিলেন বিপিনবাবু। মশারী টাঙিয়ে এবার শুয়ে পড়লেন আরাম করে। শুয়ে পড়েই অভ্যেস মতো বালিশের তলায় হাত বাড়িয়ে দিলেন বইয়ের জন্য।

কিন্তু এ কী? বই হাতে ঠেকছে না যে!

চমকে উঠে পড়লেন বিপিনবাবু। তাই তো, বই তো আনেন নি সঙ্গে! আসবার সময় তাড়াহুড়োয় ভুলে গেছেন। সেই ভুলে যাবার কথা এখন মনে হলো তাঁর। ইস্, ভুলে যাবার মুহূর্তেই যদি ভুলে যাবার কথাটা মনে হতো! সঙ্গে সঙ্গে মানসিক যন্ত্রণা শুরু হলো বিপিনবাবুর। সর্বনাশ! সারাটা রাত এবার না ঘুমিয়ে থাকতে হবে!

বিপিনবাবু ভয়ে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। একটা রাত না ঘুমিয়ে কাটানো মানে যে কি তা বহুদিন আগে একবার তিনি টের পেয়েছিলেন। পরদিন চোখটোখ লাল হয়ে গা-বমি-বমি করে অস্থির। খেতে পারেন নি পর্যন্ত। আগামীকালও ঠিক তেমনি অবস্থা হবে তাঁর।

ভাবতে ভাবতেই ভয়ে উঠে পড়লেন বিপিনবাবু। ঘরের মধ্যে পায়চারী করলেন কিছু সময়। তারপর স্যুটকেশ খুলে কিছু একটা খুঁজতে থাকলেন পড়বার জন্য। না, কিচ্ছু নেই। একটা চিঠি পর্যন্ত না।

'কি করা যায়, কি করা যায়' ভাবতে ভাবতে দরজা খুললেন বিপিনবাবু! সব ঘরের দরজা বন্ধ। কেউ জেগে নেই। ঠাকুর চাকররা পর্যন্ত নয়। কারো কাছ থেকে যে কোনো রকমের একখানা বই নেবেন তারও উপায় নেই। দারোয়ানকে দিয়ে হোটেলের গেট খুলিয়ে যে চেনাজানা কোনো বাড়িতে গিয়ে একখানা বই নিয়ে আসবেন, তাও সম্ভব নয়। তারাই বা এত রাত্রে হাঁকাহাঁকিতে কি মনে করবে?

করিডোরটা ভালো করে দেখলেন ঃ এক টুকরো কাগজও যদি পড়ে থাকে। না, তাও নেই।

এবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ভেতরের চেয়ারে বসলেন তিনি। চেয়ারে বসেই রাত কাটাতে হবে। এ ছাড়া আর উপায় কি! ঘড়ি দেখলেন, সবে দশটা বেজেছে। এখনো আট ঘণ্টা এমনি জেগে থাকতে হবে। কান্না পেতে থাকলো বিপিনবাবুর। নেহাত বয়সী বলে কাঁদতে পারছেন না। অবশ্য কাঁদলেও দেখতে পেত না কেউ।

প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ চুপচাপ বসে রইলেন তিনি। তারপর হঠাৎ আশ্চর্য একটা বুদ্ধি এল তাঁর মাথায়। উঠে পড়লেন তাড়াতাড়ি। স্যুটকেশ খুললেন। প্যাড বের করলেন, কলম বের করলেন। তারপর কিছু লিখতে চেষ্টা করলেন প্যাডের পাতায়।

কিন্তু কি লিখবেন? অনেক মাথা ঘামিয়েও একটা লাইন লিখতে পারলেন না। শেষে সেই ছেলেবেলায় মুখস্থ করা 'পাখী সব করে রব' কবিতাটার কিছুটা লিখে ফেললেন। তারপর অসম্ভব খুশিতে শুয়ে পড়লেন তিনি। চোখের সামনে সেই প্যাডখানা নিয়ে 'পাখী সব করে রব'-এর পরে আর একটা শব্দও এগোতে পারলেন না। গভীর ঘুমে তাঁর চোখ দুটো জড়িয়ে গেছে ততক্ষণে!!

ও হেনরী

শেষের পাতাটি

ভাবানুবাদ ঃ অরূপ

[**লেখক পরিচিতি ঃ** আমেরিকার মোপাঁসা—ও হেনরীর আসল নাম উইলিয়ম সিডনী পোর্টার। আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনার গ্রীনস্‌বরো শহরে ১৮৬২ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মারা যান নিউইয়র্ক শহরে ১৯১০ সালের ৫ই জুন মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে। স্বল্পস্থায়ী জীবনে মাত্র বছর দশেক তিনি সাহিত্য সাধনা করেন। এই সংক্ষিপ্তকালের সাহিত্য সাধনা তাঁকে বিশ্ব-জোড়া খ্যাতির শীর্ষে তুলে দেয়।

স্কুলের লেখাপড়া করার সুযোগ তাঁর জীবনে খুব কমই হয়েছে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁকে স্কুলের পড়া ছেড়ে দিতে হয়। তারপর সুরু হয় জীবনযুদ্ধ। নানা কাজে ঘুরে ফিরে অবশেষে তিনি এক ব্যাঙ্কে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর ঐ ব্যাঙ্কের তহবিল তছরুপের দায়ে তিনি অভিযুক্ত হন। তহবিল তছরুপের ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব কি ছিল তা নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি, তবু তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারারুদ্ধ হন। শুরু হলো তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়, সাহিত্য সৃষ্টি। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর লেখা ছোট গল্পগুলি প্রকাশ করলেন সিডনী পোর্টার কিন্তু করলেন ছদ্মনামে। সেই নাম হলো 'ও হেনরী'। হারিয়ে গেল সিডনী পোর্টার, অমর হয়ে রইল ও হেনরী। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় ও হেনরীর সাহিত্য অনূদিত হয়েছে। চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছে তাঁর গল্প।]

ওয়াশিংটন জেলার পশ্চিমের একটি শহর। ঐ শহরের রাস্তাগুলি ছিল বড় মজার; আঁকা-বাঁকা ভাঙ্গা-চোরা, হিজিবিজি—এক গোলকধাঁধার মত। লোকে বলত, ওখানে একবার ঢুকলে গোলকধাঁধার মতই ঘুরতে হবে—বার বার একই জায়গায় এসে পৌঁছুতে হবে। যেমন চেহারা রাস্তার, তেমন তার বাড়িগুলির। অষ্টাদশ শতাব্দীর তিন কোণা ছাদ আর ডাচ জানালা-ওয়ালা কিম্ভুতকিমাকার সব বাড়ি। হাওয়ায় পুরানো দিনের গন্ধ। শিল্পীর দল এসে বাসা বাঁধলো এই শহরে।

দুই তরুণী। জনসী আর স্যু। দুই বন্ধু। অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে এসে জবর-দখল-করা চার-তলা একটা বাড়ির ওপর তলায় আস্তানা গাড়লো। দুজনে মিলে একটা স্টুডিও খাড়া করে শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করল। তখন মে মাস। আর ঐ বছরই নভেম্বর মাসে শুরু হলো শহরের উপর এক অদৃশ্য

শত্রুর আক্রমণ। ডাক্তাররা এই শত্রুকে শ্রীযুক্ত নিমোনিয়া বলে অভিহিত করলেও কেউ কেউ একে 'রক্তখেকো বুড়ো' এই আখ্যা দিল।

সে যাই হোক, রোগের প্রকোপ কিন্তু দিন দিন বেড়েই চললো। শহরের পূর্বাঞ্চলটা সব থেকে বেশী বিপর্যস্ত হলো বটে, কিন্তু তাই বলে শেওলা-পড়া গলিঘুঁজিও নিস্তার পেল না। আমাদের ঐ জনসীও নিমোনিয়ার কবলে পড়ল। বেচারীর নড়াচড়ার শক্তি রইলো না। সমস্ত দিন একটা রঙ-চটা লোহার খাটে শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার আর কাজ নেই।

অসুখের তিনদিনের দিন ওখানকার ডাক্তার এসে জনসীকে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা করেই তাঁর মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠলো। স্যুকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, "ও যদি এরকম মুষড়ে পড়ে তবে আমি ওকে বাঁচাবো কি করে? বেঁচে থাকার ইচ্ছা ও একদম হারিয়ে ফেলেছে। ওষুধে কোন কাজই হচ্ছে না।" স্যু মাথা নেড়ে বললে—"সে কি! আমি তো জানি ওর বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা। ওর চোখে আছে নেপল্‌স্‌ উপসাগরের ছবি আঁকার স্বপ্ন।"

"উপসাগর আঁকার স্বপ্ন?"—ডাক্তার বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন—"ছিল নাকি? হবেও বা। তবে এখন ওসবের বাষ্পটুকুও কোথাও নেই, তা বলে দিতে পারি। যাই হোক—আমার সাধ্যমত আমি করবো। তবে আসল কথাটা হলো আত্মবিশ্বাস। ওটার ঘাটতি হলে অন্য সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে যায় কিনা!"

ডাক্তার চলে যেতে স্যু জনসীর ঘরে চলে এল। এসে দেখল যে জনসী চাদর গায়ে দিয়ে বাইরের দিকে ফিরে শুয়ে আছে। স্যু গুনগুন করে একটা গানের কলি ভাঁজছিলো, পাছে জনসীর ঘুম ভেঙে যায় তাই সেটা বন্ধ করে ছবি আঁকায় মন দিল। ছবিটা শেষ করে সম্পাদককে দিয়ে আসতে হবে আজই। নতুন নতুন লেখকদের বেলায় যেমন, অনামী শিল্পীদের বেলায়ও তেমনি। মাসিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকা-গুলিই একমাত্র ভরসা।

স্যু আঁকছিলো এক রাখালের ছবি—ঘোড়ায়-চড়া তার পোশাকটা শেষ করে সবে তখন একচোখা চশমাটা আঁকা সুরু করেছে স্যু—এমন সময় শুনতে পেল জনসীর বিছানার দিক থেকে একটা আওয়াজ আসছে। স্যু তাড়াতাড়ি জনসীর কাছে গিয়ে দেখল বড় বড় চোখ মেলে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে গুনে চলেছে—"বারো, এগারো, দশ, নয়।" তারপর একটু থেমে একসাথে—"আট, সাত।" স্যু এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। মনে মনে ভাবলে—বারো এগারো এ সবের মানে কি? বাইরে কি আছে গুনবার মতো? যতদূর চোখ যায়—একটা নীরেট দেওয়াল আর আধমরা একটা আইভিলতা। শীতের হিমেল হাওয়ায় পাতাগুলি তার প্রায় ঝরে গেছে। শ্রীহীন শীর্ণ কয়েকটা শাখালতা আকাশের দিকে বাহু তুলে আপন দীনতায় ম্রিয়মান। স্যু কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—"বাইরের দিকে তাকিয়ে কি গুনছো ভাই?"

স্যুর কথা জনসীর কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। সে আপন মনেই বলে চললো—"ছয়, আর মাত্র ছ'টি। অথচ কিছুদিন আগেও ছিল সংখ্যায় ওরা অগুনতি। গুনতে গেলে মাথা ধরে যেত। ঐ, ঐ আরও একটি ঝরে গেল—বাকী রইলো মাত্র পাঁচটি।"

স্যু অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "পাঁচটি? পাঁচটি কি? বলো জনসী, পাঁচটি কি?"

মনে হলো জনসী এতক্ষণে স্যুর কথা শুনতে পেয়েছে। বাইরের দিকে চোখ রেখেই বললে—"পাতা—আইভিলতার পাতা। একটি একটি করে সব কটি ঝরে পড়ছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না? আর, তার মানে জানো? ওই পাতা-ঝরা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসবে আমার মৃত্যু। আমি জানি, ডাক্তারও তাই ভাবছেন।"

স্যু জনসীকে ধমকে উঠে বললো, "তুমি কিছু জান না। কে বলেছে ডাক্তার অমন কথা ভাবছেন? শরতে গাছের পাতা তো ঝরবেই। তার সঙ্গে তোমার আমার জন্ম মৃত্যুর সম্পর্ক কি? এসব উদ্ভট চিন্তা তোমার মাথায় ঢুকলো কী করে?"—তারপর কোমল স্বরে বললে—"লক্ষ্মীটি, ওরকম আজেবাজে চিন্তা মনে ঠাঁই দিও না। ডাক্তার আমায় বলেছেন তুমি ভাল হয়ে উঠবে। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও। আমি ছবিটা শেষ করে ওদের দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে আসি। ঘরে তো কিছুই নেই। তোমার জন্য পথ্য কিনে আনতে হবে, আর খানিকটা খাবার আমার জন্য।"

বাধা দিয়ে জনসী বলে উঠলো—"না, না, আমার জন্য কিছু চাই না। আর তো অল্প সময়ই বাকী আছে আমার। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাকী পাতা কয়টিও ঝরে পড়বে—ঝরে পড়বো আমিও। ......এখন আমার আর কিছু চাই না।"

স্যু দেখলো জনসী বাইরের দিকে চোখ মেলে সেই

আইভিলতার দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যে কোনভাবেই হোক, ঐ আইভিলতা থেকে ওর মনটা সরিয়ে নেওয়া দরকার—এই মনে করে স্যু জনসীকে বললো, "আমার একটা কথা রাখবে জনসী? কথা দাও যে আমার ছবিটা আঁকা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আর বাইরের দিকে তাকাবে না। আলো থাকতে থাকতেই আমার ছবিটা শেষ করা দরকার। অন্ধকার হয়ে গেলে ঠিক এঁকে উঠতে পারবো না। কি, কথা দিলে তো?"

নিরুত্তাপ কণ্ঠে জনসী বললে—"কেন, তুমি ও ঘরে গিয়ে ছবিটা শেষ করতে পার না?"

"না। আমি এখানেই থাকবো। আমি এখান থেকে যাব আর তুমি আইভিলতার দিকে তাকিয়ে থেকে আজেবাজে চিন্তা করবে—এ তোমায় আমি করতে দেব না।"

জনসী বললে—"ঠিক আছে, থাকতে চাও থাক—কিন্তু ছবিটা শেষ করেই আমাকে বোলো—শেষ পাতাটির ঝরে-যাওয়া নিজের চোখে দেখতে চাই।" অস্ফুট কণ্ঠে কথাগুলি বলে চোখ বুজলো জনসী। অসীম ক্লান্তিতে সে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

স্যু জনসীর মাথার কাছে চলে এসে তার মাথাটায় হাত বুলোতে লাগল, বললে—"একটু ঘুমাও; লক্ষ্মীটি। আমি নীচের থেকে বুড়ো বারম্যানকে ডেকে নিয়ে এক্ষুণি চলে আসছি। গুহাবাসী বুড়ো মাইনারের ছবিটায় এবার হাত দেব। বারম্যান হবে আমার মডেল।"

* * *

ঐ বাড়ির একতলায় থাকে বুড়ো বারম্যান। বলে বেড়ায় চল্লিশ বছর সে শিল্পচর্চা করে আসছে। কিন্তু তার আঁকা কোনও ছবি কেউ কোনও দিন দেখেছে বলে আমাদের জানা নেই। বুড়োর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। মুখে একমুখ মাইকেল এঞ্জেলো মার্কা দাড়ি! সবসময় মুখে তার এক কথা, "একখানা মাস্টারপীস আঁকব—এই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।" সেই অনাগত মাস্টারপীস বক্ষে ধারণ করবে বলে ছবি আঁকার ষ্ট্যাণ্ডে একটা ক্যানভাস আজও বছরের পর বছর অপেক্ষা করে আছে—এ পর্যন্ত তাতে একটা আঁচড়ও অবশ্য পড়েনি। মানুষটি অত্যন্ত বদরাগী। দয়ামায়া বলে কোনও বস্তু তার নেই। অবশ্যি জনসী ও স্যুর কথা আলাদা। সে বলে বেড়ায় সে-ই নাকি ঐ মেয়ে দুটির গার্জিয়ান। এ হেন মাস্টারপীস স্বপ্ন-দেখা বারম্যানকে দিন গুজরানোর জন্য নামগোত্র-হীন শিল্পীদের মডেল হয়ে দিন যাপন করতে দেখা যাচ্ছে আজ দীর্ঘদিন ধরে।

স্যু যখন বারম্যানের ঘরে প্রবেশ করল তখন বুড়ো বারম্যান নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে আছে। ঘরে একটা দম-আটকানো উগ্র গন্ধ। স্যু এই গন্ধের সঙ্গে পরিচিত; তাই এটা উপেক্ষা করে বারম্যানের কাছে গিয়ে জনসীর কথা বললো। আইভিলতার ঝরে-যাওয়া পাতাগুলি, এক দৃষ্টিতে ঝরা-পাতার দিকে জনসীর তাকিয়ে থাকা—সব কিছুই খুলে বললো সে বারম্যানকে। বারম্যান তো সব শুনে রাগে চীৎকার করে উঠলো। সমস্ত শরীরটা তার উত্তেজনায় কাঁপছে। চোখ ফেটে জল নেমেছে দুই গালে। স্যুকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, উদ্ভট, অসম্ভব, অবাস্তব! আজগুবী এসব কল্পনা তুমিই ওর মাথায় ঢুকিয়েছ নিশ্চয়ই। আইভিলতার পাতা ঝরবে, আর জনসীর জীবন ফুরিয়ে যাবে!—দূর দূর।......না, না, তোমার মডেল টডেল আমি হতে পারবো না, এ তোমাকে আমি জানিয়ে দিলাম—হ্যাঁ।"

স্যু বারম্যানের মেজাজ খানিকটা চেনে তাই মৃদু প্রতিবাদ করে বললে—"আমি কেন ওর মাথায় ঐ সব আজেবাজে চিন্তা ঢুকোতে যাব? অসুখে ভুগে ভুগে ওর মন দুর্বল হয়ে গেছে; আর এ ধরনের চিন্তা ঢুকেছে মাথায়।" তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কৃত্রিম অভিমানের সুরে বললে, "আমার মডেল যখন তুমি হবেই না, তখন কিই বা করা যাবে। ঠিক আছে...... আমি চললাম।"

"আরে শিল্পী হোক, আর যাই হোক—মেয়েমানুষ মেয়েমানুষই। আমিও তো তোমায় ঐ কথাটাই এতক্ষণ বোঝাতে চাইছিলাম। সে যাই হোক, আমি তোমায় বলে দিচ্ছি স্যু, জনসীর মত ভাল মেয়ের থাকার জায়গা নয় এটা। দেখো, ভগবানের ইচ্ছায় ও ঠিক ভাল হয়ে উঠবে।"

তারপর আপন মনেই বলতে লাগলো—"ছেড়ে দাও ওসব কথা। অল্প দিনের মধ্যে আমি আমার মাষ্টার-পীসটা করে ফেলব। তারপর? তারপর এখানে আর থাকব না। তুমি, আমি, জনসী চলে যাব অন্য কোথাও।"

বারম্যান আর স্যু যখন জনসীর ঘরে এসে ঢুকলো তখন জনসী ঘুমোচ্ছিল। স্যু জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বারম্যানকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। পাশের ঘরে পৌঁছে দুজনেই দাঁড়ালো গিয়ে খোলা জানালাটার

ধারে। আইভিলতাটা তেমনি দেওয়ালের বুকে ঝুলে রয়েছে। কনকনে হিমেল হাওয়া বইছে শোঁ শোঁ করে। বৃষ্টি আর বরফ পড়ার কোন ছেদ নেই। হঠাৎ নজরে পড়লো শুষ্ক শ্রীহীন আইভির প্রান্তে ঝুলে রয়েছে একটা বিশীর্ণ পাতা—মনে হলো যে কোন মুহূর্তে তা ঝরে পড়বে। বারম্যান চকিতে স্যুর দিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিল। খানিকক্ষণ পরে বারম্যান ও স্যু জানালার কাছ থেকে সরে এসে ছবি আঁকায় মন দিল।

ছবি আঁকা চললো অনেক রাত পর্যন্ত। কিন্তু বারম্যানকে বেশ চঞ্চল দেখা গেল। ছবি আঁকার শেষে নিজের ঘরে ফিরে যাবার সময় বারম্যান স্যুকে বললে, "কি করে যে ওর মাথায় ঐ উদ্ভট চিন্তাটা ঢুকলো! কিন্তু সত্যিই তো এখন ঐ আইভিলতায় একটি মাত্র পাতা লেগে রয়েছে।......পাতাটা তো আজ রাতেই ঝরে পড়বে—তারপর?......না, না, জনসীকে বাঁচতেই হবে স্যু, জনসীকে বাঁচতেই হবে।"

রাত ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই স্যুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলেই দেখলো জনসী স্থির দৃষ্টিতে বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। স্যুর ঘুম ভেঙ্গেছে টের পেয়েই বলে উঠলো—"স্যু, স্যু শিগ্‌গির জানালাটা খুলে দাও। আমায় দেখতে দাও—দেখতে দাও।" স্যু ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল। কিন্তু একি? কাল রাতের ঝোড়ো আর অবিশ্রান্ত বর্ষণ উপেক্ষা করে শেষ পাতাটি লেগে রয়েছে তার আপন বৃন্তে। বৃন্তটি ঘিরে সবুজ আভা, পাতাটার প্রান্ত সীমায় হলুদের আভাস। দেখলে মনে হয় অজেয়কে জয় করে সে যেন রৌদ্র ঝলমল ঐ সকালে বিজয়ীর হাসি হাসছে।

দেখলো স্যু, দেখলো জনসীও। জনসীর সমস্ত শরীরটা ঘামে ভিজে গেল। বুকটা ওঠানামা করতে লাগল অত্যন্ত দ্রুত। আপন মনেই জনসী বলে উঠলো—"কাল রাতেই তো এটা ঝরে পড়ার কথা ছিল—এখন দেখছি পড়েনি। হয়তো, হয়তো—না, আজ নিশ্চয়ই ঝরে পড়বে।" কথাটা মনে হতেই জনসীর মুখটা ম্লান হয়ে গেল। ফিস্‌ফিস্ করে বললো—"ঝরে পড়বো আমিও।"

স্যু আর সহ্য করতে পারলো না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। "জনসী, জনসী তুমি কেবল নিজের কথাটাই ভাবছো। আমার কথাটা একবারও ভাবছ না। তুমি যদি সত্যই চলে যাও তবে আমি একা একা কি করবো আমার আর কে আছে?"

জনসী স্যুর কথায় কোন জবাব দিল না। মৃত্যুর পূর্বের অখণ্ড নিস্তব্ধতা তাকে এর মধ্যেই ঘিরে ফেলেছে। মনে হয় চারপাশে যা কিছু ওর পরিচিত সব কিছু থেকে ও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সেদিন বিকালের ম্লান আলোতে ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছিল আইভিলতাটি। আর তার একমাত্র পাতা—কিন্তু তার মৃত্যুঞ্জয়ী হাসিটি ম্লান আলোর আভায় যেন জ্বল জ্বল করে উঠলো।

রাত এলো। আর, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের শব্দ উদ্দাম হয়ে উঠলো। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা কাঁচের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সুখের রাতও শেষ হয়, দুঃখের রাতও শেষ হয়। সে রাতও শেষ হল। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসী স্যুর উপর জানলাটা খুলে দেওয়ার নিষ্ঠুর আদেশ জারি করলো।... ..না, শেষ পাতাটি ঠিক তেমনি রয়েছে। জনসী অনেক, অনেকক্ষণ পাতাটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে স্যুকে কাছে ডাকলো। স্যু কাছে এলে তার হাত দুটি চেপে ধরে বললে, "স্যু, আমি খুব খারাপ মেয়ে, না? ঐ শেষ পাতাটি আমায় কি বলছিল জান? ও যেন বলছিল, যারা মরতে চায় তারা মোটেই ভাল নয়—তারা পাপী।"

জনসীর মুখে একথা শুনে স্যুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। স্যু কিছু বলতে যাওয়ার আগেই জনসী বলে উঠলো—"আমায় একটু বসিয়ে দাও, আর কিছু খাবার—না, আগে আয়নাটা একটু দিয়ে যাও।

স্যু ত্রস্ত পায়ে পাশের ঘর থেকে আয়নাটা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই জনসী বলে উঠলো—"জান স্যু, আমার মনে হচ্ছে এবার আমার জীবনের স্বপ্ন নেপল্‌স্ উপসাগরের ছবিটা নিশ্চয়ই শেষ করতে পারব।......... সেদিনকার ঐ ছবিটা তোমার শেষ হয়েছে?"

"কোন ছবিটা?" জিজ্ঞাসা করলে স্যু।

"ঐ যে বারম্যানকে মডেল করে যে ছবিটা দুদিন আগে আঁকছিলে?"

"হ্যাঁ, শেষ হয়েছে।" বললো স্যু। "পাগলা বারম্যানকে মডেল নেওয়াতে ছবিটা উৎরেছে ভাল।" বলতে বলতে স্যুর মুখখানা এক প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠলো। স্যু বললে, "যাই বলো ভাই, বারম্যান কিন্তু তোমাকে ভীষণ ভালবাসে। তোমার ঐ অসুখের কথা শুনে খানিকক্ষণ চেঁচালো, খানিকক্ষণ কাঁদলো তারপর আমাকে প্রায় মারে আর কি?.........বলেছে কি জান? বলেছে

জনসীকে বাঁচতেই হবে—তুমি সেরে উঠলে নাকি তোমাকে নিয়ে ও অন্য কোথাও চলে যাবে।......অবশ্য আমাকেও সঙ্গে নেবে বলেছে।"

জনসীর পান্ডুর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "তাই বলেছে বুঝি বারম্যান!"

ঐ দিন বিকালে ডাক্তার জনসীকে দেখে অবাক। স্যুকে ডেকে বললেন—"স্যু তোমার বন্ধুর আর কোন ভয় নেই। তাড়াতাড়ি ও ভাল হয়ে উঠবে। সেবা যত্নটা তুমি শুধু চালিয়ে যাও। আমার একটু তাড়া আছে, বুঝলে—আমি আর এখন দাঁড়াতে পারছি না। নীচের তলায় বুড়ো বারম্যানের নিমোনিয়া হয়েছে। বুড়ো বাঁচবে না। আক্রমণটা বেশ মারাত্মকই বলতে হবে। যাই হোক, ওকে আমি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বুড়োর তো আপনজন বলতে কেউ নেই। মৃত্যুর আগে হাসপাতালে কিছুটা শান্তি পাবে—এই আশায়।"

পরদিন সকালে নীচে এক চাপা গুঞ্জন শুনতে পেয়ে স্যু তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। খানিক বাদে ক্লান্ত পায়ে ওপরে উঠে এলো সে। জনসী তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা স্কার্ট বুনছিল। ম্লান মুখে স্যু এসে তার পাশে দাঁড়ালো। অস্ফুট-স্বরে ডাকলো—"জনসী।—একটা কথা তোমায় বলতে এলাম—তুমি বোধহয় জান না যে বারম্যান—"

স্যুর তরফ থেকে আর কিছু শুনতে না পেয়ে জনসী স্যুর দিকে তাকালো। দেখলো স্যুর দু চোখে জল। জনসী অধৈর্য্যভাবে জিজ্ঞাসা করলো, "বারম্যানের কি হয়েছে?—তুমি অমন করছো কেন?"

স্যু যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, "বারম্যান আজ হাসপাতালে মারা গেছেন।"

"কেন? কি হয়েছিল তার?"

"মাত্র দু-দিনের অসুখ। পরশু সকালে আমাদের দারোয়ান দেখে, বারম্যান তার নিজের ঘরে শুয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে। জামা কাপড় তার ভেজা। প্রথমটায় দারোয়ান কিছু ঠাহর করতে পারেনি। বুড়োর জামা-কাপড় ভেজা কেন? জুতোময় কাদা। ঝড়-জলের রাতে কোথায় গিয়েছিল বুড়ো? তারপর দেখে—দরজার কাছে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন। তার পাশে পড়ে আছে একটা মই। কাছেই ছড়িয়ে রয়েছে খানিকটা সবুজ আর হলুদ রং—অদূরে একটা তুলি।"

জনসীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ধোঁয়াটে রয়ে গেল। "লণ্ঠন, তুলি, রং—এসব দিয়ে বুড়ো কি করছিল ঝড়-জলের মধ্যে?"

"কি করছিল?", অস্ফুট কণ্ঠে বললো স্যু। দৃষ্টি তার দেওয়ালের গায়ে আইভিলতাটার দিকে। তাতে তখনও লেগে রয়েছে একটি হলুদ-প্রায় বিশীর্ণ পাতা। স্থির দৃষ্টিতে পাতাটির দিকে তাকিয়ে থেকে স্যু ধীরে ধীরে বললো, "আমাদের কারো এটা মনে হয়নি জনসী, আইভির ঐ শেষ পাতাটা ঝরে গেল না কেন?—ঝড়-জল উপেক্ষা করে পাতাটি তার আপনবৃন্তে লেগে রইল কেমন করে!.........আইভির ঐ শেষের পাতাটি তো ঝরবে না.........আসলে ওতো আইভির পাতা নয়, ও যে বারম্যানের মাস্টারপীস্।"

["দি লাস্ট লীফ্" গল্পের স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ]

নন্দিনী

রবীন্দ্রকুমার বসু

সুনীতির সংগে নন্দিনীর যেমন ভাব, তেমনি আবার ঝগড়া-ঝাঁটি। সকালবেলা বিছানা থেকে উঠতে না উঠতেই, একজন আর একজনের চেহারাটা দেখতে না পেলে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে পর্যন্ত একটা-না-একটা উপলক্ষ্য করে ঐ পিঠোপিঠি ভাই-বোনের যে কতো ঝগড়া-ঝাঁটি হয়, আর তা পরিণত হয় হাতাহাতি-মারামারিতে, তার আর অন্ত নেই।

সেদিন দুপুরের দিকে আকাশটা কালো মেঘে ছেয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি পড়তে লাগলো মুষলধারে। এমনি যখন প্রাকৃতিক অবস্থা, তখন সুনীতি পা টিপে টিপে এল ঘরে। দুপুরবেলা ওদের মা বাঁশরী একরকম জোর করেই নন্দিনীকে ঘুম পাড়ান। আজও ওকে নিয়ে শুয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সুনীতিকে ঈষৎ ফাঁককরা ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়ে নন্দিনী উসখুস করে উঠলো। মার মুখের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখলে ও। তিনি তখন তন্দ্রালু হয়ে চোখ বুজেছেন।

নন্দিনী কোন শব্দ না করে আস্তে আস্তে নেমে পড়লো খাট থেকে। নিঃশব্দে ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করলে। তারপরই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সুনীতি ওকে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। নন্দিনী ওকে অনুসরণ করে যেতে যেতে বললে, ওদিক পানে যাচ্ছিস যে, ছোড়দা?

সুনীতি নিজের ঠোঁটের ওপর বাঁ হাতের একটা আঙুল রেখে ইসারায় চুপ করতে বলে নন্দিনীর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস করে বললে, শব্দ করিসনে। মা এখুনি উঠে আসবে। একটু থেমে বললে, ছাদে আয়। জানিসনে, এমনি বৃষ্টির দিনে আচার খেতে কেমন লাগে?

আনন্দে লাফিয়ে উঠলো নন্দিনী একথা শুনে। ফিস্‌ফিস করে বললে, বেড়ে লাগে ছোড়দা। কুলের আচারের চাইতে আমার কিন্তু ভালো লাগে আমের আচার।

সুনীতি সেকথার প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে সিঁড়ি দিয়ে তেতলার ছাদে উঠতে লাগলো। এই তেতলার ছাদে একটা ছোট্ট ঘর আছে। ঘরখানা অল্প পরিসর বটে, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানে বাঁশরী দৈনন্দিন পূজা-অর্চনা করেন। ছেলেমেয়েদের উৎপাতের ভয়েও বটে, এবং শুদ্ধাচারে রাখার জন্যও বটে, তিনি আচার তৈরি করে এই ঘরের মধ্যে একটা লুকোনো জায়গায় আচার সমেত জার রেখেছিলেন গোটা কতক। কুলের আচার, আমের আচার, আমের মোরব্বা, পাকা তেঁতুলের আচার, আমতেল, আমড়ার আচার—এই সব আর কি!

ছাদের দরজায় শিকল লাগানো। সুনীতি সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়ে পিছন ফিরে দেখলে—নন্দিনী তার ঠিক দু'-ধাপ নীচে দাঁড়িয়ে।

—দরজাটা কি করে খুলবি রে ছোড়দা?

—কেন! মনে করেছিস, আমি শিকলটায় হাত পাইনে বলে ওটা খুলতে পারবো না? ফুঃ! এটা তো নস্যি রে! এই এতো উঁচুউঁচু বেড়া টপ্‌কে সেদিন যে বয়েজ ক্লাবের রেসে ফার্স্ট প্রাইজ পেলুম, সেটা কি তবে শুধুশুধু?

বলতে বলতে সুনীতি দরজার পাশের জানালার একটা খড়খড়ি খুলে তার ওপর একখানা পা রেখে, অপর পা খানা রাখলে দরজার কড়ার ওপর এবং পর-মুহূর্তে বেশ উঁচু হয়ে ডান হাত দিয়ে অতি সহজেই খুট করে খুলে ফেললে দরজাটার শিকল। তারপর নেমে পড়ে বললে—দেখলি তো পারলুম কিনা। আমি তো তোর মত ছিঁচকাঁদুনে নই যে খালি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদবো।

নন্দিনীর ভারী রাগ হলো সে কথা শুনে। সে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একহাতে খানিকটা আমের মোরব্বা এবং আর এক হাতে পাকা তেঁতুলের আচার নিয়ে সুনীতি নন্দিনীর সামনে এসে দাঁড়াল। ডান হাতখানা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—নে, আর গোঁসাই সেজে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, নে—নে।

নন্দিনী একবার চোখ নামিয়ে সুনীতির হাত দুটির দিকে দৃষ্টিপাত করলো। ওর মুখ হয়ে উঠলো প্রসন্ন। ছোড়দার হাত থেকে তেঁতুলের আচারটা খপ করে তুলে নিয়েই প্রায় অর্ধেকটা মুখে পুরে চুষতে লাগলো। বললে—বেড়ে লাগছে রে ছোড়দা।

সুনীতি বোধকরি এর জন্যে তৈরী ছিল না। তৈরী ছিল না মানে, নন্দিনী যে আমের মোরব্বার পরিবর্তে নেবে তেঁতুলের আচার, এটা ও ভাবতে পারে নি।

তা সে যাই হোক, সুনীতি তার চোখ দুটি পাকিয়ে রীতিমত মুরুব্বীয়ানা চালে নন্দিনীকে লক্ষ্য করে বললে,—তুই ওটা নিয়ে মুখে পুরলি যে বড়ো? ওটাতো আমার জন্যে। তোর জন্যে তো এই মোরব্বাটা।

নন্দিনী হাতের অবশিষ্ট আচারটুকু মুখে পুরে দিয়ে বললে, আ-হা-হা! আমি যেন বানের জলে ভেসে এসেছি। ভালোটি খাবেন উনি, আর খারাপটির বেলা আমি—বারে!

—খারাপ মানে? আমের মোরব্বাটা খারাপ?

—তবে তুই ওটা খা না ছোড়দা। ভালোটা না হয় তুই-ই খা!

—ভারী যে পাকাপাকা কথা শিখেছিস! এক থাপ্পড়ে মুণ্ডু দেবো ঘুরিয়ে। পাজি, ছুঁচো কোথাকার! আমায় আবার বড়দির মতো উপদেশ দেওয়া হচ্ছে।

নন্দিনী এ কথায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে মুখের আচারটুকু শেষ করে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো। বললেঃ ছোড়দা, তুই রাগ করিস নে ভাই। যা না ঐ ঘরটার ভেতর। আরো খানিকটা তেঁতুলের আচার নিয়ে আয় না। আর হাতের ওটা আমাকে দে, বুঝ্‌লি?

বলতে বলতে ও দেবার অপেক্ষামাত্র না করে নিজেই সুনীতির হাত থেকে আমের মোরব্বাটুকু তুলে নেবার উপক্রম করতেই, হঠাৎ তার কচি. নরম গালে একটা চড় এসে পড়লো ঠাস্‌ করে।

—লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! তোমার এই কাণ্ড! একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছে, আর অমনি পালিয়ে এই ঝড়-বৃষ্টিতে ছাদে এসে আচার চুরি করে খাওয়া হচ্ছে? ছাদের দরজাটাই বা কে খুল্‌লে?

এই অতর্কিত লাঞ্ছনায় নন্দিনীর ভাসা ভাসা চোখ দুটি অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠলো। কান্নামাখানো স্বরে থেমে থেমে বললে—আমি খুলেছি নাকি? খুলেছে তো ছোড়দা!

সুনীতি তার বাঁ-হাতটা পিছন দিক করে একপাশে দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঠিক এই আশঙ্কাই হয়তো করছিল। মাকে ও বাঘের মতোই ভয় করে।

বাঁশরী ছেলের দিকে এলেন এগিয়ে। বললেন—তুই খুলেছিস্‌?

সুনীতি এ প্রশ্নের জবাব দিলে না। জবাব দিতে সাহস করলে না। শুধু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বাঁশরী সুনীতির দুটো কান বেশ ক'রে মলে দিলেন। তারপর দুজনেরই হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন নীচে।

এর দিন কয়েক পরে, একদিন সকালের দিকটায় সুনীতির ওপর ভার পড়েছিল নন্দিনীকে পড়াবার। একটু আগে সুনীতি গোটা পঁচিশ বুক ডন দিয়েছে। ব্যায়াম সে রোজ প্রত্যূষেই সেরে নেয়। ওদের শোবার ঘরের মেঝেতে একখানা ছোটো মাদুর বিছিয়ে বাবু হয়ে বসেছে নন্দিনী। আর ওরই সুমুখে গুরুমশাইয়ের মতো বই হাতে করে বসে সুনীতি। বোনকে উদ্দেশ্য করে বললে—বানান কর্‌ 'ঈষৎ'।

নন্দিনী বার কয়েক ঢোঁক গিলে সুর টেনে টেনে বলতে লাগলো—হ্রস্ব-'ই' দন্ত-'স' আর 'ত'—ঈষৎ'।

সুনীতি মুখ ভেংচে নন্দিনীর কথা হুবহু নকল ক'রে বললে—হ্রস্ব-'ই' দন্ত-'স' আর 'ত'—'ঈষৎ'। তোর

জন্যে দেখছি নতুন করে বর্ণপরিচয় লিখতে হবে। কিস্‌সু তোর হবে না। বুড়ো ধাড়ি মেয়ে। 'ঈষৎ' বানান্ করতে পারে না! যা, দূর হয়ে যা।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নন্দিনী বললে—ভারী আমার গুরু-মশাই এসেছেন রে! তুই তো পড়াতেই জানিস নে।

সুনীতি রাগ করে বইখানা বোনের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে—তবে এসেছিস্ কেন আমার কাছে পড়তে? আমার পড়া কামাই ক'রে তোকে পড়াবার আমার কী এমন গরজ পড়েছে? নেহাত মা বলেছিল, তাই না!

নন্দিনী বইখানা হাতে তুলে নিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চোখ নাচিয়ে, মুখ বেঁকিয়ে বললে—বয়ে গ্যাছে আমার তোর কাছে পড়তে! মা জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলে তাই না। তুই তো নিজেই পড়া বলতে পারিস নে।

সুনীতি এবার ক্ষেপে গিয়ে বললে—খবরদার বলছি নন্দা, আমাকে রাগাসনে। এমন মার দেবো না—

নন্দিনী মাথা নেড়ে বললে—তা' আর মারতে হয় না। মাকে তোর ভয় নেই? সেদিন আমার কান মলে দিয়েছিলি মার সামনে। মা তোকে কী রকম মারলে; ভুলে গেছিস্ বুঝি?

বোনের এই শ্লেষ-উক্তিতে কি জানি কেন সুনীতি রাগ করলো না। বরঞ্চ ওর সুন্দর মুখে সরল হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বললে—কিন্তু সেদিন মার খেয়ে সন্তোষ ময়রার দুশো রাবড়ির ভাগটা শুধু আমারই ভাগ্যে জুটেছিল। তুই তো সেদিন পিট্-পিট্ করে রাবড়ির দিকে চেয়ে আমার খাওয়ায় দিচ্ছিলি নজর।

শুনে নন্দিনীর মুখখানা অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠলো। মুখ ভার করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ এক সময় বই, শ্লেট নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে বললে—নজর দিয়েছি না হাতী! তুই তো এক নম্বরের পেটুক। আচার চুরি করে খাস্, আম চুরি করে খাস্,—যেখানে যা খাবার জিনিস থাকে খুঁজে খুঁজে খাস্ চুরি করে। কারুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গেলে চেয়ে চেয়ে খালি হ্যাংলার মতো পেট ভর্তি করিস্। মা সেদিন বলছিল, যার পেটে তিল থাকে, সে বড্ডো পেটুক হয়। তোর পেটে তো তিল আছে।

সুনীতি গায়ের স্যাণ্ডো গেঞ্জিটা দু'হাতে টেনে পেটের নীচে নামাতে নামাতে বললে—খুন্ করে ফেলবো কিন্তু নন্দা। তুই আমাকে চিনিস্ নে। জানিস্, আমার সঙ্গে গায়ের জোরে কেউ পারে না?

নন্দিনী বললে—কী আমার পালোয়ান রে!

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুনীতির ডান হাতখানা সজোরে গিয়ে পড়লো নন্দিনীর বাঁ-গালে। নন্দিনী চীৎকার করে কেঁদে উঠলো—ও মাগো! ছোড়দা আমায় মেরে ফেললে গো!

নীচের দালানে বসে বাঁশরী আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলেন বঁটি দিয়ে। হঠাৎ মেয়ের অমন চীৎকার শুনে বঁটি ফেলে হন্তদন্ত হয়ে দোতলায় উঠে এলেন। এসেই মেয়ের গালে পাঁচ আঙুলের তাজা দাগ দেখে সুনীতির মুখের দিকে তাকালেন।

বাঁশরীর যেন হঠাৎ রক্ত মাথায় উঠে গেল। নিজেকে সামলাতে না পেরে পিঠের ওপর ঝোলানো চাবির গোছা বাঁধা শাড়ীর আঁচল দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন সুনীতিকে। প্রহারের তাড়নায় সুনীতি চোখ বুজলো। কিন্তু আশ্চর্য ওর সহ্যশক্তি! মুখ দিয়ে একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করলো না। মার রাগ দেখে নন্দিনী গালের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে কান্না থামিয়ে ফেলেছিল। এখন ছোড়দার জন্যে ও আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। মার শাড়ীর এক প্রান্ত হাত দিয়ে চেপে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতেই বললে—ওমা, আর মেরো না। ছোড়দা মরে যাবে মা!

বাঁশরীও হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। চাবির গোছা শুদ্ধ শাড়ীর আঁচলটা পিঠের যথাস্থানে ঝুলিয়ে ছেলের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলেন—ওর পিঠ, হাত আর মুখের একদিকটা কেটে-ছড়ে বেরিয়ে পড়েছে রক্ত। বাঁশরীর চোখেও জল এলো।

বাজার থেকে ফিরে এসে সত্যেন্দ্র বিছানায় শায়িত সুনীতিকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বাজার যাবার সময় দেখে গেলেন ভালো ছেলে, দু'খানা ইঁট মেঝেতে রেখে বুক-ডন দিচ্ছে, আর এসে দেখলেন,—মুখে, হাতে, পিঠে জলপট্টি লাগানো ছেলে বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে! সত্যেন্দ্র বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাবার সাড়া পেয়ে নন্দিনী আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল ওঁর পাশে। অপরাধীর মতো ও সত্যেন্দ্রর কোল ঘেঁষে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বললে—বাপি?

কি মা?—সত্যেন্দ্র স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাইলেন।

নন্দিনী সজলচোখে একবার বাবার দিকে চেয়েই ওঁর কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললে। বললে—ছোড়দাকে মা বড্ডো মেরেছে, বাপি।

সত্যেন্দ্র মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—ছোড়দা বুঝি খুব দুষ্টুমি করেছিল?

নন্দিনী কান্নামাখা স্বরেই বললে—না বাপি। দুষ্টুমি করেনি ছোড়দা। ছোড়দা আমাকে পড়াচ্ছিল। আমিই ওকে যা খুশী বলে রাগিয়ে দিয়েছিলুম। তাই ছোড়দা আমার গালে ঠাস্ ক'রে একটা জোরে চড় মারে। আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠতেই, মা ছুটে এসে ছোড়দাকে চাবির গোছা দিয়ে খুব মেরেছে। আমার-ই দোষ বাপি। আমি চেঁচিয়ে না কাঁদলে তো মা জানতে পারতো না, আর ছোড়দাও মার খেতো না। আমাকে তুমি মারো বাপি। আমি দোষ করেছি।

সত্যেন্দ্র মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে আদর ক'রে বললেন—তোকে কী আমি মারতে পারি রে! তুই যে আমার মা!

সেদিন রাত্রেই সুনীতির জ্বর হলো। দিন চার-পাঁচ কেটে গেল। তবু জ্বর ছাড়লো না। বাঁশরী স্বামীর কাছে এসে মুখ ভার করে বললেন—তুমি ডাক্তার বদলাও। সরোজ মুখার্জী ভালো ডাক্তার। ওঁকেই দেখাও।

সত্যেন্দ্র ডাক্তার ডাকতে চলে গেলেন।

বাঁশরী চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ডান দিকের খানিকটা পথ পার হয়ে সুনীতির ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন—নন্দিনী ওর ছোড়দার মাথার কাছে বসে স্নেহময়ী বড়দির মতো সুনীতির মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

বাঁশরী ঘরে এলেন। ছেলের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে আর্দ্র স্বরে বললেন—মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝি খুব, বাবা?

সুনীতি বোনের হাতখানা পরম স্নেহে চেপে ধরে বললে—নন্দা কি রকম সেবা করতে শিখেছে, মা! আমার মাথায় কী যন্ত্রণাই না হচ্ছিল। এখন অনেক কমেছে।

বাঁশরী একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন, এমন সময় সত্যেন্দ্র ডাক্তারকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকলেন।

ডাক্তার মুখার্জী সুনীতিকে ভালো করে পরীক্ষা করে ও সব কিছু শুনে নিয়ে প্রেস্‌কৃপসন লিখে দিয়ে বললেন—এই ওষুধটা কোন ভাল দোকান থেকে এখুনি তৈরি করিয়ে এনে খাইয়ে দিন। আজ বিকেলেই মনে হয় জ্বর ও গায়ের ব্যথা কমে যাবে।

সত্যি দেখা গেল, সুনীতির জ্বর সন্ধ্যের একটু আগেই ছেড়ে গিয়েছে। আর তার সঙ্গে অনেক কমে গেছে শরীরের ব্যথা। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হলো। উনি হেসে বললেন—পরশু ওকে ভাত দেবেন।

আজ সুনীতি দুটি ভাত আর মাগুর মাছের ঝোল পথ্য করবে। নন্দিনীর এজন্যে আনন্দের আর অন্ত নেই। ভোর হতে না হতেই সে বাঁশরীকে ঠেলাঠেলি করে বিছানা থেকে উঠিয়ে দিলে। বললে—আজ ছোড়দা ভাত খাবে, তুমি কি ভুলে গেছ, মা? বাপীকে এখুনি বাজার যেতে বলো। একটা বেশ মোটাসোটা রকম মাগুর মাছ আনবে ছোড়দার জন্যে। আর তার সঙ্গে একটা কচি কাঁচকলা।

বাঁশরী মেয়ের কথা শুনে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

বেলা একটু বাড়তেই রান্নাঘরে গিয়ে বামুন ঠাকুরকে নন্দিনী ঘন ঘন তাগাদা দিতে লাগলো—কী হলো তোমার, ঠাকুর? এখনো ঝোল হলো না? এদিকে যে দশটা বাজতে চললো—ছোড়দা খাবে কখন শুনি? আজ কদিন হলো ছোড়দা ভাত খায় নি। খিদে পায় না বুঝি?

দশ বছরের পুরোনো বামুন ঠাকুর হাসতে হাসতে বললে—এই যে হলো দিদি। ডাক না তোমার ছোড়দাকে!

খাওয়া হয়ে গেল সুনীতির। নন্দিনী পাশেই বসেছিল। হাঁ-হাঁ করে উঠলো, মাছটার সবটা না খেয়েই উঠে পড়লি ছোড়দা?

সুনীতি ডান হাতের পাঁচটা আঙুল জিব দিয়ে চাটতে চাটতে বললে গম্ভীর ভাবে—ওটা তোর জন্যে রইলো। তুই না মাগুর মাছ খেতে ভালোবাসিস্! সবটা খেলে আমার পেটে হজম হবে না।

বাঁশরী পাশেই বসেছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে নন্দিনী বললে—দেখছো মা, ছোড়দা কী সব বলছে?

তারপর সুনীতিকে লক্ষ্য করে বললে—ভালো হবে না কিন্তু, ছোড়দা! তোর মাছে আমি দেব নজর?

সুনীতি সে কথায় জবাব না দিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বললে—নন্দা, মাছটা খেয়ে চট্ করে ওপরে উঠে আয়। লুডো খেলতে তুই তো খুব ভালবাসিস্। আর জানিস্ তো, ভাত খেলে আমার ঘুম পায়। মা বারণ করে দিয়েছে আজ দুপুরে ঘুমোতে।

নন্দিনী ততক্ষণে সুনীতির রাখা বাকী মাছটুকু খেতে বসে গেছে। চেঁচিয়ে বললে—তুই সাজা ছোড়দা। লাল ঘুঁটি আমি নেব কিন্তু। আমি এই এলুম বলে।

কর্মফল

[নাটক]

তমাল চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

চন্দ্রগড়ের রাজা	কাশীজোড়ার রাজা
চন্দ্রগড়ের মন্ত্রী	দেবী সরস্বতী
চন্দ্রগড়ের রাজ-জামাতা চিন্ময়	মা লক্ষ্মী
চন্দ্রগড়ের রাজকন্যা চম্পা	ধর্মদেব

এক

[রাজকক্ষ। চন্দ্রগড়ের রাজা চিন্তিতভাবে বসে, বৃদ্ধ মন্ত্রীর প্রবেশ]

রাজা॥ আসুন মহামন্ত্রী।

মন্ত্রী॥ মহারাজ কি আমায় স্মরণ করেছেন?

রাজা॥ হ্যাঁ, আপনাদের বিচারের সিদ্ধান্ত কি শুনতে চাই। মনে আছে আজ চতুর্থ দিবস? হাতে মাত্র আর তিন দিন।

মন্ত্রী॥ (লজ্জিত) এ বিচার সম্ভব হয়নি মহারাজ।

রাজা॥ (ভ্রূ কুঁচকে) সম্ভব হয়নি? এ কী প্রলাপ! রাজসভায় এত জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত.........

মন্ত্রী॥ (বাধা দিয়ে) অপরাধ নেবেন না মহারাজ, যেখানে আপনার মত সুবিচারক রাজা—সারা রাজ্যে যাঁর খ্যাতি—নিজে এ বিচারে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে ত............

রাজা॥ (অধৈর্য্য) কিন্তু মন্ত্রী, বিচার ত এর একটা করতেই হবে। চিন্তায় আজ চারদিন ধরে আমার মাথার ভেতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে—কি বিভ্রাট—ওঃ! ধর্ম, কর্ম, লক্ষ্মী, সরস্বতী বিচারে যাকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলব, অপর তিন জন ক্রুদ্ধ হয়ে আমায় অভিশাপ দেবেন। আর বিচার না করতে পারলেও সমূহ বিপদ।

মন্ত্রী॥ মহারাজ! (একটু থেমে) শেষ উপায়, আপনি বরং রাজ্যে ঘোষণা করে দিন যে, তিন দিনের মধ্যে এ বিচার-সমস্যার সমাধান যে করতে পারবে তাকে আপনি পুরস্কৃত করবেন।

রাজা॥ (আশার আলো দেখে) ঠিক, ঠিক বলেছেন মন্ত্রী। আপনি এখুনি আমার রাজ্যে ঘোষণা করে দিন যে, যে কেউ এ বিচারে আমার মান রাখতে পারবে আমি তাকে আমার অর্ধেক রাজত্ব পুরস্কার দেব।

মন্ত্রী॥ অর্ধেক রাজত্ব!!

রাজা॥ হ্যাঁ—(অনেকটা আপন মনে) ,এবং সেই সঙ্গে রাজকন্যা দিতেও আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু হতভাগী চম্পা রাজমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে সামান্য একটা চোরের গলায় মালা দিয়ে রাজপুরী ত্যাগ করে গেছে—উঃ.........মন্ত্রী, এই আমার শেষ আশ্বাস—আপনি এখনই রাজ-আদেশ প্রচারের ব্যবস্থা করুন।

মন্ত্রী॥ যে আজ্ঞা মহারাজ।

দুই

[রাজ-জামাতা চোরের কুঁড়ে। চোর ও রাজকন্যা চম্পা]

চম্পা॥ এই শুনছো! আচ্ছা, সারাদিন তুমি এভাবে একা বসে কি ভাব বলত?

চোর॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ভাবি নিজের অদৃষ্টের কথা চম্পা। অদৃষ্টের পরিহাসে মানুষের জীবনে কত কিই না ঘটতে পারে।

চম্পা॥ আবার, আবার শুরু করলে?

চোর॥ বেশ, কি বলবে বল?

চম্পা॥ (অভিমানভরে) বলব কাকে! সারাটা দিন ত নিজের ভাবনা নিয়েই মশগুল হয়ে রয়েছ।

চোর॥ কি, ব্যাপার কি?

চম্পা॥ চন্দ্রগড় রাজ্যে আজ কদিন ধরে যেন একটা বিভীষিকা নেমে এসেছে, রাজ্যের প্রতিটি প্রজা যেন আতঙ্কে স্তব্ধ। বাবা, মা.........ওঃ, কি সর্বনাশ যে হবে তাদের!

চোর॥ আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না চম্পা।

চম্পা॥ চার দেবদেবী—ধর্ম, কর্ম, লক্ষ্মী ও সরস্বতী বাবাকে এক মহাসঙ্কটের মধ্যে ফেলেছেন। সাত দিনের মধ্যে তাঁকে বিচার করে বলতে হবে, ওদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। এ কি সোজা কাজ! চিন্তায় ত বাবা প্রায় পাগলের মত। শেষে রাজ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন, এ কঠিন বিচার যে করতে পারবে তাকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব পুরস্কার দেবেন।

চোর॥ তাহলে ত এ সুযোগ ছাড়া মোটেই বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়।

চম্পা॥ (ভয়ে ও বিস্ময়ে) সে কী! তুমি কোন্ সাহসে এ বিচারের ভার নিতে চাইছ? একেই ত আমাদের জীবন দুঃখে কষ্টে জর্জরিত। তার ওপর এ বিচারে দেবদেবীর যাকেই শ্রেষ্ঠ বলবে অমনি অপর তিন জন রুষ্ট হয়ে যাবেন। তাহলে আমাদের জীবনে আরো যে কি ভীষণ দুর্দিন. ......উঃ.........না, না, না ওগো লক্ষ্মীটি তোমার পায়ে পড়ি—এ বিচারের ভার তুমি নিও না, কিছুতেই না।

চোর॥ (স্মিত মুখে) কিন্তু কি জান চম্পা, তোমার বাবাকে একমাত্র আমিই এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি। শুধু তাই নয়, হয়ত সেই সঙ্গে আমরাও এ দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাব।

চম্পা॥ কিন্তু বিচার সঠিক না হলে যে রাজসভায় তোমায় সবাই অপমান করবে। (কান্নাভাঙা গলায়) আমি চোখের সামনে তা কি করে সইব বল? ওগো দোহাই তোমার—সেধে আর নতুন কোন বিপদ ডেকে এনো না।

চোর॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) অনেক অপমানই ত জীবনে সয়েছি চম্পা। তবে আর কিসে ভয় বল? আমি জানি, কোন এক দেবতা কিংবা দেবীকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করলেই অপর তিন জন শুধু আমার ওপরেই রেগে যাবেন না, হয়ত তোমার বাবার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন। আর তা যদি হয় তবে......

চম্পা॥ (কথা শেষ না হতে, কান্নাভাঙ্গা গলায়) বাবা নিশ্চয়ই তোমায় এমন শাস্তি দেবেন যা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

চোর॥ তুমি একটু শান্ত হও চম্পা। আমার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যে ভাবেই হোক শুধু একটি বারের জন্যে তোমার বাবাকে রাজী করাও। লক্ষ্মীটি, আমার কথা রাখ।

চম্পা॥ বেশ, আমি যেমন করে পারি বাবাকে রাজী করাব। রাজ্যের অমঙ্গল, বাবার সর্বনাশ—এ আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না।

চোর॥ আর এক মুহূর্ত দেরী নয়। তোমার বাবাকে গিয়ে বল, এ কঠিন বিচারের ভার তাঁর চোর জামাই সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব নিতে রাজী। তবে হ্যাঁ, রাজ্যের লোভে নয়, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে।

তিন

[রাজ-জামাতা চোরের কুঁড়ে। রাজ-জামাতা ও চম্পা]

(চম্পা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে)

চম্পা॥ (সহাস্যে) ওগো, বাবাকে আমি রাজী করিয়েছি। বাবা রাজী হয়েছেন তোমার হাতেই বিচারের ভার দিতে।

চোর॥ আশ্চর্য! আমি ত ভেবেছিলাম তাঁকে রাজী করানো তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

চম্পা॥ রাজী কি সহজে হয়েছেন! কিন্তু আর তো কোন উপায়ও ছিল না। এখন পর্যন্ত রাজ্যের আর কেউই এ বিচারের ভার নিতে রাজী হয়নি, অথচ হাতে আর একটা দিনও নেই।

[দূরে ঢাকের আওয়াজ]

চোর॥ তার মানে কালই প্রত্যূষে বিচার?

চম্পা॥ হ্যাঁ, ওই ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ না? রাজ্যময় ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে যে, আগামীকাল প্রত্যূষে রাজসভায় চার দেবদেবীর বিচার বসছে.........

চোর॥ (কথা শেষ হবার আগেই) আর বিচার করছে রাজ-জামাতা—একজন সামান্য চোর—(হেসে) প্রজাদের

কাছে এ কিন্তু ভারী মজার খবর—কি বল চম্পা, অ্যাঁ! হাঃ হাঃ হাঃ.........

[দূরে থেকে ঘোষকের কণ্ঠ ও ঢাকের আওয়াজ ক্রমেই এগিয়ে আসে]

চার

[পরদিন প্রত্যূষ। রাজসভা। ভীষণ উত্তেজনা, গোলমাল]

মন্ত্রী॥ (সকলকে উদ্দেশ্য করে) চন্দ্রগড় রাজ্যের প্রজাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা গোলমাল করবেন না। (গোলমাল থেমে যায়) আজকের এই যুগান্তকারী বিচার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে। বিচারের বিষয়বস্তু আপনারা জানেন—সরস্বতী, লক্ষ্মী, ধর্ম ও কর্ম এই চার দেব-দেবীর মধ্যে ক্ষমতায় কে শ্রেষ্ঠ, তার রায় দেওয়া। বিচার করবেন রাজ-জামাতা। কেবল মাত্র আজকের এই গুরুত্বের কথা ভেবেই রাজা তাঁকে বিচারের ভার গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত তিনি এসে পৌঁছন নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই বহু বিশিষ্ট অতিথিকে আপনারা রাজসভায় দেখতে পাচ্ছেন—মহারাজের ডান পাশে কাশীজোড়ার বিখ্যাত রাজা দেবনারায়ণ রায়, পাশাপাশি অন্যান্য মিত্ররাজ্যের রাজারাও রয়েছেন। সামনে ঐ রত্নখচিত সোনার সিংহাসন। একে একে দেবদেবীরা এসে ওতেই উপবেশন করবেন।

[আবার গুঞ্জন, রাজ-জামাতা চোরের প্রবেশ]

আসুন, আসুন রাজ-জামাতা। বিচারের সময় উত্তীর্ণপ্রায়।

চোর॥ আমি প্রস্তুত মহামন্ত্রী। এখন মহারাজের আদেশ পেলেই আমি বিচার শুরু করতে পারি।

রাজা॥ (গম্ভীরভাবে) আমি আদেশ দিলাম। ঘণ্টাধ্বনি করে বিচারের সময় ঘোষণা করা হোক।

[ঘণ্টাধ্বনি]

বিচারক (চোর)॥ আমি আমার বিচারের প্রথমেই দেবী সরস্বতীকে আবাহন করছি। তারপর পর্যায়ক্রমে মা লক্ষ্মী, ধর্ম ও কর্মদেব।

[সরস্বতী দেবীর প্রবেশ]

আসুন মা, প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনাকে এখন কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

সরস্বতী॥ (সস্নেহে) প্রশ্ন কর, আমি নিশ্চয়ই উত্তর দেব।

বিচারক॥ বেশ, তবে বলুন তো মা আমি কে?

সরস্বতী॥ তুমি! তুমি হলে কাশীজোড়ার রাজা দেবনারায়ণ রায়ের একমাত্র ছেলে।

[মুহূর্তে রাজসভার সকলে বিস্মিত, বাক্‌হীন, তারপর ওঠে গুঞ্জন]

বিচারক॥ (সকলকে) আপনারা দয়া করে চুপ করুন। আমায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে দিন। (সরস্বতীকে) বলুন মা। বিদ্যায় আমার অনুরাগ ছিল কি না?

সরস্বতী॥ হ্যাঁ, ছেলেবেলায় তোমার বিদ্যাশিক্ষায় খুবই অনুরাগ ছিল। তোমার বাবাও তাই তোমার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন, কিন্তু রাজ্যের সেনাপতির কুচক্রান্তে তোমার জীবনে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এল। সেনাপতি চেয়েছিল রাজ্য থেকে তোমার নির্বাসন—যাতে রাজার মৃত্যুর পর কাশীজোড়ার রাজ্য সে দখল করতে পারে। রাজার বিশ্বাসের সুযোগে বারবার সে রাজার কাছে তোমার নামে অপদার্থতার অভিযোগ এনে তোমার ওপর তাঁর মন বিষিয়ে তুলল। অবশেষে একদিন সেনাপতির ইচ্ছা পূর্ণ হল—কাশীজোড়ার রাজা তোমায় নির্বাসন দিলেন তাঁর রাজ্য থেকে। সেই থেকে তুমি আজও নির্বাসিত।

বিচারক॥ হুঁ, আচ্ছা মা, তাহলে আমার এই দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী কে? বিদ্যাশিক্ষায় আমি ছিলাম আপনার প্রিয় অনুরাগী। তবু আমি অপদার্থ প্রমাণিত হলাম কেন? কেনই বা মিথ্যা অপবাদ বয়ে বেড়াতে হচ্ছে আজও?

সরস্বতী॥ সবই কর্মফল বাবা।

বিচারক॥ আপনি তাহলে স্বীকার করলেন যে, কর্মের ওপর আপনার কোন হাত নেই; অর্থাৎ কর্ম আপনার চেয়ে বড়।

[সরস্বতী নিরুত্তর]

বেশ মা, তবে আর আপনাকে কষ্ট দেব না। আপনি যেতে পারেন।

বিচারক॥ (সসম্ভ্রমে) আসুন মা লক্ষ্মী, আপনার আগমনের দ্যুতিতে রাজসভা আজ আলোকিত। উপবেশন করুন।

লক্ষ্মী॥ কল্যাণ হোক পুত্র।

বিচারক॥ আপনি আমায় চেনেন মা?

লক্ষ্মী॥ হ্যাঁ বাবা চিনি বৈকি, তুমি কাশীজোড়ার রাজা দেবনারায়ণ রায়ের পুত্র চিন্ময়।

বিচারক॥ আপনি কি সে রাজ্যে অধিষ্ঠিত?

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ, তোমার পিতার রাজ্য আমি ধনধান্যে পূর্ণ রেখেছি। আজও আমার এতটুকু অসম্মান কেউ করেনি।

বিচারক ॥ আমি কি কখনও আপনার কোন অসম্মান করেছি মা?

লক্ষ্মী ॥ না পুত্র।

বিচারক ॥ তবে আপনার কৃপা আমি কখনও হারাইনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজাদেশে নির্বাসিত হয়ে কেন অন্নকষ্ট পেলাম মা?

লক্ষ্মী ॥ কি বলব বল? সবই কর্মফল।

বিচারক ॥ (সবিনয়ে) তাহলে আপনিও স্বীকার করলেন, কর্ম আপনার চেয়ে বড়?

লক্ষ্মী ॥ (মৃদু হেসে) তুমি বুদ্ধিমান চিন্ময়।

[মা লক্ষ্মীর প্রস্থান। রাজসভায় চিন্ময়ের নামে আবার গুঞ্জনধ্বনি উঠতে থাকে। ইতিমধ্যে ধর্মের প্রবেশ]

বিচারক ॥ (সকলকে) আপনারা গোলমাল করবেন না, ধৈর্য্য ধরুন—আমার বিচার শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই। এখন দেখছেন, আপনাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন ধর্মরাজ স্বয়ং। (ধীরে ধীরে গোলমাল থেমে যায়) (ধর্মরাজকে) ধর্মরাজ, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ধর্ম ॥ (গম্ভীর কণ্ঠে) কল্যাণমস্তু। তোমার প্রশ্ন কর, চিন্ময়।

বিচারক ॥ হে দেব, তবে দয়া করে বলুন, পিতার রাজ্য ত্যাগের পর আমার কি অবস্থা হল।

ধর্ম ॥ পিতার রাজ্য ছেড়ে এক সন্ধ্যায় তুমি এসে হাজির হলে এই চন্দ্রগড়ে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তুমি সে রাতটা এক গরীব কৃষকের ঘরে আতিথ্য নিয়েছিলে।

বিচারক ॥ তারপর?

ধর্ম ॥ রাত তখন গভীর। হঠাৎ তোমার ঘুমটা ভেঙে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়ল, তিনজন লোক সেই কৃষকের ঘর থেকে তার সঞ্চিত সামান্য অর্থটুকু চুরি করে পালাচ্ছে। ধার্মিক তুমি তা চুপ করে দেখতে পারলে না। তাদের পিছু নিলে। তারপর অদৃষ্টের পরিহাসে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। তোমারই হাতে টাকার থলিটা গুঁজে দিয়ে পালিয়ে গেল চোরগুলো। আর গোলমালে কৃষক যখন ছুটে এল, দেখতে পেল তোমার হাতেই তার কষ্টার্জিত অর্থের থলিটা। তুমি যে চুরি করনি, তা সে কিছুতেই বিশ্বাস করল না।

বিচারক ॥ সেই থেকে এ রাজ্যে আমার চোর অপবাদ, তাই না?

ধর্ম ॥ হ্যাঁ বৎস।

বিচারক ॥ তবেই দেখুন ধর্মরাজ—কর্মফলের কাছে আপনার শক্তি কত অসহায়। সেদিন উপকারীর উপকার করে আমি তো ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করতেই চেয়েছিলাম।

ধর্ম ॥ সত্যিই তুমি সুবিচারক চিন্ময়। কর্মের কাছে পরাজয়ে আমার আজ এতটুকু লজ্জা নেই। তবে বিদায় নেবার আগে একথাও তোমায় জানিয়ে যাই যে, কর্মের দুর্ভোগ সাময়িকভাবে মানুষকে অসহায় করে বটে, কিন্তু মানুষের উচিত—পুরুষকার দিয়ে সে অদৃষ্টকে জয় করতে চেষ্টা করা। তোমার কল্যাণ হোক।

[ধর্মের প্রস্থান। রাজসভায় কাড়া-নাকাড়া বেজে ওঠে]

রাজা ॥ (উল্লসিত কণ্ঠে) ধন্য, আমি ধন্য। কুমার চিন্ময় আজ আমার মান রেখেছে। আমার কণ্ঠের এই মোতির মালা আজ আমি সানন্দে তোমার গলায় পরিয়ে দিলাম, কুমার। আজ থেকে আমার অর্ধেক রাজত্বের অধিকারী হলে তুমি।

[সমবেত জয়ধ্বনি 'জয় মহারাজের জয়' 'জয় কুমার চিন্ময়ের জয়]

রাজা দেবনারায়ণ ॥ পুত্র, আজ আমি পুত্রগর্বে গর্বিত। কিন্তু এতদিন না জেনে তোমার প্রতি যে নির্মম অমানুষিক ব্যবহার করেছি, তা ভেবে এ প্রকাশ্য রাজসভায় আমি লজ্জায় তোমার সামনে মাথা তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছি না।

চিন্ময় ॥ নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে আমার কারুর প্রতি কোন অনুযোগ নেই বাবা—সবই কর্মের ফল। তবে আপনারা আশীর্বাদ করুন, অদৃষ্ট জয়ের সেই অভয়মন্ত্র যেন লাভ করতে পারি। (চম্পাকে) এস চম্পা, গুরুজনদের প্রণাম করে আজ এ পুণ্যদিন আমরা সার্থক করে তুলি।

[মঙ্গলশাঁখ বেজে ওঠে, সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি—'জয় মহারাজের জয়' 'জয় কুমার চিন্ময়ের জয়']

রেখায় ও লেখায়—সূর্য রায়
'সর্বান্তঃকরণে'
১.
মোক্ষম শব্দটা।
'আমি এই প্রস্তাব' — বলেই অন্ধকার দেখল সুধীর
'সর্বান্তঃকরণে'
হেড্‌স্যার কথাটা ধরিয়ে দিয়ে সভাপতি হয়ে বসলেন।
বৃদ্ধ বাংলাস্যারের ফেয়ারওয়েল নির্বিঘ্নে সমাধা হলো সেদিন
২.
নতুন বাংলাস্যার
—'চাই সাহস— চাই দুর্জয়
—বানান কর বদি
কিংকর্তব্যবিমূঢ়—
৩.
স্যার, K I N G
কিং—ক র্‌ ত......
৪.
আর ঠকবো না আমরা
ডিকসেনারি মুখস্থ করবি আয় বদি
৫.
পেলাম কোথায় ?
ঐ যে ও বছর গান গেয়ে প্রাইজ পেলাম—মানে চাপা পড়লাম

চল আর একটাকেও চাপা দিয়ে আসি
৬.
কুষ্মাণ্ডের দাম কত ?
বাঃ—আমার নাম জানলে কি করে ? বাংলাস্যারের ছাত্র বুঝি ?
তাইতো — অবসর নেবার পর বাংলাস্যারের কোন খবরই তারা নেয়নি
৭.
কে রে—কে ? দাঁড়া নাম বলছি তোদের—
আমি অন্ধ, তবু দেখতে পাচ্ছি তোদের !
৮.
কিংকর্তব্যবিমূঢ় ওরা —সুধীর ও বাদি
৯.
প্রণাম করতে এগিয়ে এলো
১০.
সর্বান্তঃকরণে তোদের আশীর্বাদ করছি বাবা !
সর্বান্তঃকরণে— কথাটা মনে থাকবে তো রে ?
১১.

ইতিহাসের দিনলিপি

মহাকাল রায়

৩রা জানুয়ারী ঃ

গণবক্তৃতা-মঞ্চ। রোম্যানরা বলে রোস্ট্রা।

সকাল থেকেই এখানে ভিড় জমছে। হয়ত কেউ ওখানে বক্তৃতা দিচ্ছেন। কোনও রোম্যান নেতা সেকালে জনতার সামনে কোনও বক্তব্য রাখতে হলেই এখানে এসে বক্তৃতা দিতেন। রোম তখন ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—রিপাবলিক। সেনেটের সভ্যরা প্রায়ই এখানে ভাষণ দিতেন।

হয়ত তেমন কোন সেনেট-সভ্য বক্তৃতা দিচ্ছেন।

কিন্তু ওখানে পৌঁছে নীরব রোস্ট্রার দিকে তাকিয়ে দর্শকরা ভয়ে-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

রোস্ট্রার দেওয়ালে পেরেক দিয়ে গাঁথা রয়েছে একটি দেহহীন মুণ্ড আর কনুই পর্যন্ত কাটা ডান হাতখানা।

কে ও?—একজন সভয়ে শুধাল।

চিনতে পারছ না! সিসারো!—আর একজন বলল।

সিসারো! নীরবে শিউরে উঠল সমবেত দর্শক। শ্রেষ্ঠ বাগ্মী মহাপণ্ডিত সিসারো! রাজনৈতিক নেতা, পণ্ডিত আইনজীবী, সুলেখক এবং দেশশাসক—বলতে গেলে রিপাবলিক রোমের গর্বের মানুষ। কিন্তু কে অমন ভাবে হত্যা করল ওঁকে?

অ্যান্টনি!—ফিসফিস করে বলল কেউ কেউ।

—হাঁ, হতে পারে। এই ত কদিন আগেও এই রোস্ট্রায় দাঁড়িয়ে উনি অ্যান্টনির কড়া সমালোচনা করলেন। প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন রোম ও রোমের রিপাবলিককে। রিপাবলিকের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র, কোন মিথ্যাকে তিনি কখনো ক্ষমা করেন নি, অপূর্ব বাগ্মিতার মাধ্যমে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। জুলিয়াস সীজার, অকটাভিয়ান, অ্যান্টনি—সকলের দোষত্রুটি উনি আমাদের শুনিয়েছেন।

সেকালের রোমের এই শ্রেষ্ঠ বাগ্মী আর মহাপণ্ডিত মারকাস টুলিয়াস সিসারোকে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের তেতাল্লিশ বছর আগে (বি. সি. ৪৩) শাসক অ্যান্টনির সৈনিকরা হত্যা করে।

খ্রীষ্টের জন্মের একশ ছয় বছর আগে (৩রা জানুয়ারী ১০৬ বি. সি.) সিসারো জন্মগ্রহণ করেন। উনি ছোটবেলা থেকে ছিলেন খুবই মেধাবী। সাহিত্য, দর্শন ও আইন সম্বন্ধে পড়াশুনো করে জনপ্রিয় অসাধারণ বাগ্মী হয়ে ওঠেন। এবং কয়েক বছরের মধ্যেই রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ হিসাবে পরিচিত হন।

ত্রিশ বছর বয়সে সিসারোর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। আইনের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। একান্ত-ভাবেই রিপাবলিকের ভক্ত ছিলেন তিনি। আর সেজন্যেই তিনি সেনেট-বিরোধী ষড়যন্ত্রে সিজারের সঙ্গে যোগ দেন নি। আবার ঠিক একই কারণে তিনি অ্যান্টনি ও অক্‌টাভিয়ানের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

বাগ্মী সিসারো লেখক হিসাবেও সবিশেষ জন-প্রিয়তা লাভ করেন। তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলো সংগ্রহ করে বহু পুস্তক সঙ্কলিত হয়েছে।

৬ই জানুয়ারী ঃ

পঞ্চদশ শতাব্দী। সারা ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলোর মধ্যে এতটুকু শান্তি নেই। হানাহানি লড়াই চলছে। ইংলিশ চ্যানেলের দু পারের দুটি দেশের মধ্যে লড়াইয়ের বিরাম নেই। এপারে ইংল্যাণ্ড—দেশের রাজা ষষ্ঠ হেনরী। ওপারে ফরাসী দেশ। দেশের রাজা ষষ্ঠ চার্লস মারা গেছেন আর রাজকুমার চার্লস রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েও সিংহাসনে বসতে পারছেন না। কারণ রাইমসের রাজপ্রাসাদেই ফরাসী দেশের রাজাদের

রাজ্যাভিষেক হওয়ার রেওয়াজ—কিন্তু রাইমস্ শহর যে ইংরেজের দখলে।

এমন দিনে এক চাষী-কন্যা এসে রাজকুমার চার্লসকে বললেন—আমি ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছি, ইংরেজদের হাত থেকে ফ্রান্সকে বাঁচাব।

একদম অবিশ্বাস্য কথা! যুদ্ধ করতে শেখে নি, ঘোড়ায় চড়তেও জানে, না, এমন একটি কিশোরী কন্যা কি করে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করবে? কিন্তু করারও ত কিছু নেই। রাজকুমার চার্লস যেমন অলস, তেমনি ভীরু। তাই উপায়ান্তর না দেখে চাষীর কন্যাটিকেই তিনি কিছু সৈন্যের পরিচালনার ভার দিলেন।

এই চাষী-কন্যাটি হচ্ছেন ফরাসীদেশের জাতীয় বীরাঙ্গনা জোয়ান অব আর্ক। পদানত জন্মভূমি ফ্রান্সকে তিনি নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে তুলে-ছিলেন। সাদা-রঙের বর্মে শরীর ঢেকে মস্ত বড় একটা কালো ঘোড়ায় চেপে বীরাঙ্গনা জোয়ান অব আর্ক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করতেন। তাঁর প্রেরণায় ফরাসীরা অরলিয়ন্সের লড়াই জিতল, রাইমস্ শহর মুক্ত করল। অভিষেক-উৎসব শেষ হলে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসলেন রাজকুমার চার্লস।

কিন্তু ১৪৩০ সালের ২৩শে মে ফরাসীরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করে বীরাঙ্গনা জোয়ানকে বন্দিনী করে মাত্র দশ হাজার ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে ইংরেজদের হাতে তুলে দিল। ইংরেজরা জোয়ানের বিচার করল ডাইনী বলে। বিচারক ছিল একজন ফরাসী পাদরী। সমস্তটাই সাজানো—বিচারের প্রহসন। বিচারে রায় হল প্রাণ-দণ্ডের। ইংরেজরা ঊনিশ বছরের চাষীর মেয়ে বীরাঙ্গনা জোয়ানকে পুড়িয়ে মারল।

জোয়ান অব আর্কের জন্ম ১৪১২ সালের ৬ই জানুয়ারী। মৃত্যু ১৪৩১ সালের ৩০শে মে।

১২ই জানুয়ারী:

তরুণ ছাত্রটি জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবানকে দেখেছেন?

প্রশ্নের ধরনেই প্রকাশ পাচ্ছিল তরুণটির মনের অবস্থা। যাঁকে কেউ দেখতে পায় না, কেউ দেখে নি, তাঁর অস্তিত্বে কে বিশ্বাস করে? তরুণটি ছিলেন নাস্তিক। ভগবানের অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাস নেই।

কিন্তু পরবর্তী কালে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। তরুণটির মতামত সম্পূর্ণ পালটে গেল। তিনি হলেন আস্তিক—পুরোপুরি ভগবানে বিশ্বাসী। শুধু তাই নয়। আরামের জীবন ত্যাগ করে দেশকে ও দেশের সাধারণ মানুষকে সেবা করার আদর্শেও দীক্ষিত হলেন তিনি। এই তরুণটি হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর দীক্ষাগুরু হচ্ছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সহায় সম্বলহীন বিবেকানন্দ বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে সারা বিশ্ব চমকে যায়। সে মহাসম্মেলনে যেমন তিনি হিন্দু ধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, সব মানুষই সমান। পথের ধারে সামান্য অছ্যুৎ ভাঙখোরের কাছ থেকে হুঁকো চেয়ে নিয়ে তামাক খেতেও তাঁর আটকাত না। কারণ তিনি বলতেন—চন্ডাল ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই। তিনি বিশ্বাস করতেন, নিপীড়িত জনসাধারণের মুক্তির ভিতর দিয়েই বিশ্বে একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকারের স্বাধীনতা। সেবার আদর্শ নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামকৃষ্ণ সেবা-শ্রম সংঘ। বাঙলা প্রবন্ধ লেখায় তাঁর হাত ছিল পাকা। সে যুগে তরুণ বাঙালীর তিনি ছিলেন আদর্শ ও দীক্ষাগুরু। তাঁর জন্ম হয় ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী এবং মৃত্যু হয় ১৯০২ সালের ২রা জুলাই।

১৮ই জানুয়ারী:

বাইরে ঝড় ফুঁসছে। তুষার ঝড়।

আর তাঁবুর মধ্যে সামান্য একটা বাতি জ্বালিয়ে ডাইরি বা দিনলিপি লিখছেন একজন ইংরেজ পুরুষ। লেখা শেষ করলেন তিনি : আর মাত্র এগার মাইল পথ—প্রতিদিন আমরা তাঁবু গোটাতে চাইছি। কিন্তু তাঁবুর বাইরে ফুঁসছে প্রচন্ড তুষার ঝড়।...বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি।...বুঝতে পারছি, শেষের দিন খুব দূরে নয়। বড় কষ্ট হচ্ছে, আর লিখতে পারছি না...

ডাইরিখানা মাথার কাছে রেখে আলো নিভিয়ে দিলেন তিনি। সেই তাঁর শেষ লেখা।

পরে উদ্ধারকারীরা দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের তুষার-প্রান্তরে এই ডাইরি-লেখক আর তাঁর সঙ্গীদের মৃত-দেহগুলো খুঁজে বের করেছিলেন, পেয়েছিলেন তাঁর ডাইরিখানাও।

এই ডাইরি-লেখক হচ্ছেন ইংলন্ডের জাতীয় বীর ক্যাপ্টেন রবার্ট ফ্যালকন স্কট। দক্ষিণ মেরু জয় করার জন্য ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে ক্যাপ্টেন স্কট সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে যাত্রা করেন। দক্ষিণ মহাসাগর পার হয়ে তিনি হাজির হলেন মেরু প্রান্তরে। সেখান থেকে শুরু হল তাঁদের হাঁটাপথে বরফ পার হওয়া। দীর্ঘ

দুর্গম ভয়ঙ্কর সেই পথ পার হয়ে অবশেষে ক্যাপ্টেন স্কট আর তাঁর তিনজন সঙ্গী দক্ষিণ মেরুতে পেঁছলেন। সেটা ১৯১২ সালের ১৮ই জানুয়ারীর সকালবেলা।

কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, ব্যর্থ হয়ে গেছে তাঁদের এত দুঃখকষ্ট অভিযান। ঠিক এক মাস আগে নরওয়ের নাবিক আমুণ্ডসেন দক্ষিণ মেরু জয় করে ফিরে গেছেন তাঁর জন্য একটি বার্তা রেখে। ক্যাপ্টেন স্কট হলেন দ্বিতীয় মেরু-বিজয়ী—অমর অভিযাত্রী।

২৩শে জানুয়ারীঃ

বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল ছেলেটি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। পরাধীন দেশে ইংরেজ অধ্যাপকদের দুর্দান্ত প্রতাপ। যে-কোনও ত্রুটির জন্য যে-কোন ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে তাঁদের অসুবিধা হয় না। সব জেনেশুনেও তরুণ ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসু অধ্যাপকের অন্যায় আচরণের সক্রিয় প্রতিবাদ করলেন। আর তার ফলে পেলেন শাস্তি।

ছাত্র-বয়স থেকেই সুভাষচন্দ্র ছিলেন নির্ভীক—ছিলেন অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করার বিরোধী। মেধাবী ছাত্র তিনি—বিলেত থেকে আই-সি-এস পাশ করে এলেন। সবাই ভাবলেন, উনি এবার মোটা মাইনের সরকারী চাকরী নেবেন। কিন্তু সব ছেড়ে তিনি দেশের কাজে যোগ দিলেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, জেলে গেলেন।

কিছুকাল পরে। সারা ভারত কংগ্রেসের সভাপতি হলেন সুভাষচন্দ্র বসু—দেশের মানুষের প্রিয় নেতা পরের বছরও সভাপতি হওয়ার জন্য দাঁড়ালেন তিনি। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা—গান্ধী-জওহরলাল-প্যাটেল—সবাই তাঁর বিরুদ্ধে। তবু নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হলেন। সেটা ১৯৩৯ সাল। তরুণ ভারতের অবিসম্বাদী নেতা সুভাষচন্দ্র! নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর কংগ্রেস নেতারা তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করায় তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে নতুন দল গঠন করলেন।

দেশের সব নেতারা যখন শাসক ইংরেজের অনুকম্পার উপর নজর রেখে স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, সুভাষচন্দ্র তখন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নূতন পথ নিলেন। শাসক ইংরেজের অতন্দ্র প্রহরা এড়িয়ে তিনি জার্মানী চলে গেলেন। এলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। তখন যুদ্ধ চলছে। জাপানের হাতে হেরে ইংরেজরা একটার পর একটা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র গড়ে তুললেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। সেই ফৌজ নিয়ে ইংরেজের হাত থেকে তিনি মণিপুর কেড়ে নিলেন। ইম্ফলে স্বাধীন ভারতের স্বাধীন পতাকা তুললেন। তাই ত মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সৈনিক হিসাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দেশের মানুষ এত ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। ১৮৯৭ সালে ২৩শে জানুয়ারী কটক শহরে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৯৪৫ সাল থেকে নেতাজী অন্তর্হিত হয়েছেন। জনরব, বিমান-দুর্ঘটনায় তিনি পরলোক গমন করেছেন।

২৫শে জানুয়ারীঃ

১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী। সামান্য গ্রাম সাগরদাঁড়ীর দত্তবাড়ীতে আনন্দের হিল্লোল উঠল। সবাই খুশী। রাজনারায়ণ দত্তের একটি ছেলে হয়েছে। মা জাহ্নবীদেবী ছেলের নাম রাখলেন মধুসূদন।

পায়রার চোখের মতন শান্ত জল কপোতাক্ষের। তার ধারে ধারে খেলে বেড়ান মধুসূদন, মায়ের কাছে শোনেন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী। আর তখন থেকেই কবিত্ব-শক্তি তাঁর মনের সবটুকু জুড়ে বসে।

ন বছর বয়সে মধুসূদন পিতার সঙ্গে কলকাতায় এলেন এবং হিন্দু কলেজে পড়াশুনা শুরু করলেন।

ইংরেজীর অধ্যাপক রিচার্ডসনের খুব প্রিয় ছিলেন তিনি। তাঁর প্রেরণায় মধুসূদন ইংরেজী কবিতা লিখতে শুরু করেন। মনে প্রাণে মধুসূদন ছিলেন বিদ্রোহী। তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খৃীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন। নাম হল মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তখন তাঁর বয়স উনিশ। এর ফলে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়লেন তিনি।

শেষে মাদ্রাজে চাকরি করতে গেলেন। সেখানে লিখলেন 'ক্যাপটিভ লেডি' ও 'ভিসন্‌স্ অব দি পাস্ট' কাব্য-গ্রন্থ। কিন্তু বাঙালী কবির রচিত ইংরেজী কাব্য-গ্রন্থ ইংরেজের সমাদর লাভ করল না। মধুসূদন মনে আঘাত পেলেন। কিন্তু নিরাশ হলেন না। এবার হাত দিলেন বাংলা কবিতা রচনায়।

ফিরে এলেন তিনি কলকাতায়। বাংলায় তাঁর কাব্য-গ্রন্থ বের হল 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। সাড়া পড়ে গেল বাংলা-দেশে। বাংলায় তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। তিনি রচনা করলেন 'পদ্মাবতী' নাটক। বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা বাংলা কাব্যের নতুন স্বাদ লাভ করলেন। এর পর বের হল তাঁর বাংলা সাহিত্যের অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ কাব্য'। এই সমস্ত কাব্যই তাঁর আশ্চর্য উদ্ভাবন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবির আসন লাভ করলেন তিনি।

১৮৭৩ সালে ২৯শে জুন তিনি পরলোক গমন করেন।

• পরিচালক •
আনন্দ বর্ধন

সমব্যথী

ভক্তিপদ কর্মকার

ডাক্তার তরুণ মুখার্জীর নাম সকলের মুখে মুখে। শহরের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার তরুণ মুখার্জী—বিলাতফেরত। এখন শহরেই প্র্যাকটিস করেন। বিরাট চারতলা বাড়ী। নীচের তলায় চেম্বার। পাশের ঘরগুলি নানা রকম ওষুধে ভর্তি।

ডাক্তার মুখার্জী একদিন তাঁর চেম্বারে বসে এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছেন। এমন সময় একটি পাঁচ-ছ বছরের ছেলে এসে মুখার্জীর কাছে হাত পেতে দাঁড়াল, বলল—বাবু, দুটো পয়সা। আজ তিন দিন আমি কিছু খাইনি।

মুখার্জীর বন্ধুটি তাকে ধমক দিয়ে বের করে দিতে চাইলেন। ডাক্তার মুখার্জী বাধা দিয়ে বললেন—আহা করছিস কি?

পকেট থেকে একটি সিকি বের করে ছেলেটিকে দিয়ে তিনি হঠাৎ কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। মনে পড়ে গেল তাঁর ছেলেবেলার একটি ঘটনা।

একটি ছোট ছেলে। তার বাবা ছিলেন কারখানার শ্রমিক। যা মাইনে পেতেন, তা দিয়ে কোন রকমে তাদের সংসার চলতো। কিন্তু ভগবানের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! এত কষ্টের সংসারেও একদিন নেমে এল শোকের ছায়া। পুলিসের গুলিতে হঠাৎ প্রাণ হারালেন তার বাবা। বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তার মা শোকে ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হলেন।

মায়ের ওষুধ পথ্যের জন্য নিরুপায় ছেলেটি তখন ভিক্ষে করতে শুরু করে। শতছিন্ন পোশাক তার অঙ্গে।

একদিন ফুটপাতে একটি ভাঙ্গা কৌটা হাতে নিয়ে সে ভিক্ষে করছে। কিছুদূরে দাঁড়িয়ে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ্য করছিলেন। পায়ে পায়ে তিনি এগিয়ে এলেন একসময়, ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন তার পরিচয়। তারপর বললেন—খোকা, তুমি আমার বাড়ি যাবে? কাজ করবে, খাবে, থাকবে?

ছেলেটি সজল নয়নে বলল—বাড়ীতে আমার মার যে অসুখ। আমি ওষুধপথ্য কিনে না নিয়ে গেলে মা খাবে কি?

ভদ্রলোকটি ছিলেন ডাক্তার। ছেলেটির মার অসুখ শুনে তিনি বললেন—তাই নাকি? চলো, তোমার মাকে দেখে আসি।

শহরের শেষে একটা মাঠ। সেই মাঠ পার হয়ে বস্তির একটা ঘরের সামনে এসে তাঁরা দাঁড়ালেন। নোংরা ছোট্ট ঘর—ভাঙ্গাচোরা। ঘরের ভিতর অন্ধকারে ছেলেটির মা শুয়ে আছেন। ডাক্তার তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে রোগিনীর নাড়ি দেখলেন। কিন্তু হায়, তখন সবশেষ! মা মারা গেছেন। সকল দায় থেকে ছেলেকে মুক্তি দিয়ে তিনি চলে গেছেন পরপারে।

ছেলেটির মনে কত আশা ছিল, মাকে বাঁচিয়ে তুলে আবার নূতন করে ঘর বাঁধবে। কিন্তু সে আশা তার মনেই রয়ে গেল। দরদর করে অশ্রু ধারা নেমে এল তার চোখ বেয়ে। ছেলেটি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। তারপর তার সে কী বুকফাটা কান্না ও হাহাকার!

ডাক্তার অনেক বলে কয়ে ছেলেটিকে নিজের বাড়ীতে

নিয়ে গেলেন। তারপর দশ বছর কেটে যায়। ছেলেটি তত দিনে ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রীর মনের অনেকখানি অধিকার করে নিয়েছে। লেখাপড়াও শিখেছে অনেক। ডাক্তারের বড় ইচ্ছা, তাকে ডাক্তারী পড়াবেন। ডাক্তারের আশা পূর্ণ হয়েছিল। ছেলেটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করল। কলেজেও কৃতিত্ব দেখাল। তারপর ডাক্তারবাবু তাকে ডাক্তারি পড়বার জন্য বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। ডাক্তারবাবুর কোন সন্তান ছিল না। তাই ছেলেটিই তাঁর সন্তানের স্থান পূরণ করেছিল।

আরও সাত বছর কেটে যায়। ছেলেটি তখন যুবক। ডাক্তার হয়ে সে বিলেত থেকে ফিরে এল। একটি হাসপাতালে ডাক্তারবাবু আগেই চাকরি ঠিক করে রেখেছিলেন। যুবক ফিরে এসে সেখানে চাকরি পেল। নিজেও চেম্বার খুলে বসল।

তারপর আরও কেটে গেল কয়েকটা বছর। ডাক্তারবাবু হঠাৎ গুরুতর এক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। যুবকটি প্রাণপণে তাঁর চিকিৎসা করতে লাগল। কিন্তু বাঁচাতে পারল না ডাক্তারবাবুকে।

মরবার আগে ডাক্তারবাবু বলে গেলেন—আমাকে যেমন যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করলি, সব রোগীকেই এমনিভাবে চিকিৎসা করবি। ধনী-গরীব সবাইকে দেখবি তুই সমান চোখে। তবেই এই চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা তোর সার্থক হবে। মানুষের সেবাই হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম।

কাঁদতে কাঁদতে যুবকটি এর উত্তরে বলেছিল—বাবা, আমি প্রাণ দিয়ে আপনার কথা পালন করবো। আমি কথা দিলাম।

যুবকটি আজও সে কথা ভোলে নি। সকল সময় তার কানে বাজে সে কথা।

সেই ছেলেটিই আজ বিলেতফেরত শ্রেষ্ঠ ডাক্তার তরুণ মুখার্জী।

তরুণ মুখার্জীর চোখের সামনে ভেসে উঠল অতীত দিনের সেই ছবিটি। তাই তাঁর বন্ধু গরীব ছেলেটিকে ধমক দিয়ে বের করতে যেতেই তিনি বাধা দিলেন।

জাগো রে কিশোর দল

জয়ন্তচন্দ্র সান্যাল

কিসের শঙ্কা
বাজাও ডঙ্কা
   জাগো রে কিশোর দল,
ওই অসুস্থ
কাঙাল-দুস্থ
   মোছো ওর আঁখি-জল।

ত্যজি ভয়-লাজ
জাগো সবে আজ
   ঘুচাও মুনাফা-নৃত্য,
হয়ে এলো দিন
হয়ে যাবে লীন
   সৃষ্ট প্রভু ও ভৃত্য।

মহাজাগরের দুন্দুভি বাজে
দিকে দিগন্তে; সাজো রণ-সাজে,
   কিশোর, অমিতবল,
গাও আজ সবে জীবনের জয়
অত্যাচারীর হবে পরাজয়—
   ওরা ক্ষীণ—দুর্বল।

বনের খবর

সৈয়দ আহসান জমিল

হুলো বেড়ালের ছা',
গোঁফেতে দেয় তা,
   শেয়ালমশাই গান জুড়েছেন—
লা-ল্লা-ল্লা—লা।

●

রামছাগলের লম্বা ঠ্যাং,
নাচে শুধুই ড্যাডাং ড্যাং,
   খিক্ খিক্ খিক্ হেসে শুধুই—
টিট্‌কারী দেয় কটর ব্যাঙ্।

●

হাতি নাড়ায় লম্বা শুঁড়,
জুড়ল গাধা নতুন সুর,
   তাই না দেখে রেগে মেগে—
বানর বলে—'দূর, দূর'।

●

সিংহমশাই দুলে দুলে,
শ্যাম্পু করে কোঁকড়া চুলে,
   ভালুকটা তো কেঁদেই মরে—
বোলতা ভায়ার বিস্ময় হুলো॥

কয়েকটি হাস্যোজ্জ্বল মুহূর্ত

মানিকলাল দাশ

বয়স অল্প। কিন্তু বয়স অল্প হলে কি হবে, দুষ্টুমিতে পাকা। স্কুলের পড়াশুনোয় মোটেই মন নেই। কিন্তু বাড়িতে পড়াশুনো করে অনেক বিষয়ে। ওদের বাড়িটা ছিল আবার শিক্ষায়-দীক্ষায় খুবই উন্নত।

সেবার একজন ভদ্রলোক এলেন ওদের বাড়িতে। ভদ্রলোক সুপণ্ডিত। ওদের বাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন। লোকটি ভাবুক আর শিশুর মত সরল।

যেদিন তিনি এসেছিলেন সেদিন ছিল ১লা এপ্রিল —'এপ্রিল ফুলের দিন'। ছেলেটি ভদ্রলোককে নিয়ে একটু মজা করবার লোভ সামলাতে পারলো না। তার এক দাদার সহায়তায় সে মুখে দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে যথাযথ পোশাক পরে এক পার্শীর বেশ ধারণ করলে। তারপর তার দাদাকে দিয়ে সেই ভদ্রলোককে বলালে যে, বোম্বে থেকে এক পার্শী ভদ্রলোক এসেছেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চান ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে।

শুনে আপনভোলা ভদ্রলোক তো ভীষণ খুশী।

ছেলেটি ছদ্মবেশে এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দিলে—ইংরেজী সাহিত্যের বড় বড় সব কবি মিল্টন, শেক্সপীয়ার, শেলী, প্রভৃতি সম্পর্কে।

এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন সেই পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তিনি এক নজরেই ছেলেটির ছদ্মবেশ ধরে ফেললেন, তার সামনে গিয়ে বললেন, "আরে! কি হচ্ছে কি? অ্যাঁ, ছোঁড়া তো কম ফাজিল নয়!" বলেই তিনি একটানে তার নকল দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির বন্যা বয়ে গেল সারা ঘরে। ভদ্রলোক তো থ! বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন ছেলেটার দিকে।

সেদিনের এই দুষ্টু ছেলেই ছিল বিশ্বমানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর সেই ভদ্রলোক হলেন বিশিষ্ট কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।

একবার রবীন্দ্রনাথ ঈজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় চোখ বুজে বিশ্রাম করছেন। এমন সময় একজন ভদ্রলোক এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি ভাবলেন, গুরুদেব হয়তো ঘুমিয়ে আছেন, ফিরে যাওয়াই সঙ্গত। নিঃশব্দে প্রণাম সেরে তিনি উঠে দাঁড়াতেই অবাক! দেখলেন, কবিগুরু ঘুমোন নি। পিট্ পিট্ করে চেয়ে রয়েছেন তাঁর দিকে। অপ্রস্তুত হয়ে ভদ্রলোক বললেন, "ভেবেছিলাম আপনি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাই..."

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "উঁহুঁ,
প্রণাম করিতে এলে
চক্ষু দুটি রাখি মেলে,
জুতো জোড়া যায় পাছে চুরি!"

অপূর্ব! ভদ্রলোক হেসে ফেললেন।

কোন এক জায়গায় সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এসেছেন সেই সভায়। যে জায়গায় সম্মেলন হচ্ছে, সে জায়গায় নাকি ভীষণ জুতো চুরি যায়। শরৎচন্দ্র এটা জানতেন। তাই তিনি করলেন কি, নিজের জুতো জোড়া কাগজে মুড়ে নিয়ে সভায় এলেন এবং কবিগুরুর পাশেই বসলেন। জুতোর মোড়কটা রইল তাঁর কোলে। একটু পরে একজন ভদ্রলোক এসে রবীন্দ্রনাথকে কি যেন বলে গেলেন কানে কানে।

সভা চলেছে। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন শরৎচন্দ্রকে, "ওটা কি হে কোলে?"

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন, "এই একখানা বই।"

মুচকি হেসে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "বই? তা কি বই হে—পাদুকাপুরাণ?"

শরৎচন্দ্র বোকা বনে গেলেন।

এমনি আমুদে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সময় এবং সুযোগ পেলেই রঙ্গপরিহাস করতে ছাড়তেন না।

একবার এক সভায় তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হতেই শুনলেন যে, বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইয়ে গোপেশ্বর বাঁড়ুজ্জে এর পর গান গাইবেন। ব্যস্, ঘোষকের ঘোষণা শেষ হতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, "দাড়িশ্বরের পর এবার তাহলে গোপেশ্বরের পালা!"

হাসির হর্‌রা উঠলো সভায়।*

---

*কয়েকটি বিভিন্ন রচনার সাহায্য নিয়ে লেখা।

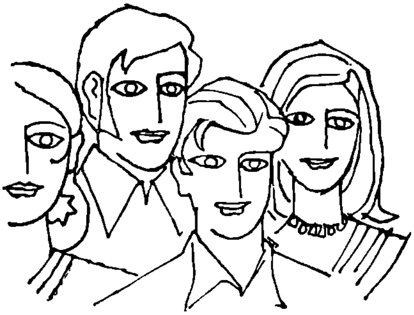

খোলা মনের মেলাতে

সুজনবন্ধু

মুর্শিদাবাদ থেকে **রাজেন্দ্রকুমার শেঠী** লিখেছে ঃ

প্রিয় সুজনবন্ধু, যখনই আমি 'খোলামনের মেলাতে' পড়ি, তখনই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমার মতই লক্ষ লক্ষ কিশোরের মুখচ্ছবি। তারা যেন আজ পথহারা পথিকের ন্যায় বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পথ দেখাবার কেউ নেই।

সুজনবন্ধু, আজ যখন দেশের কিশোররা তাদের চলার পথে পাথেয় হিসাবে কিশোর ভারতীকে পেয়েছে, তখন তোমার উচিত তাদের পাথেয়টুকু বন্ধ না করে তাদের আরও রসদ জোগাড় করে দেওয়া। পারবে তো, সুজনবন্ধু?

ভাই রাজেন, তোমার প্রশ্নের জবাবে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দিক থেকে চেষ্টার এতটুকু ত্রুটি হবে না কোন দিন। প্রতি মাসে কিশোর ভারতী প্রকাশের সময়, তোমার মতো সম্পাদকীয় বিভাগেরও চোখের সামনে ভাসে শুধু দেশের লক্ষ লক্ষ কিশোর-তরুণের ম্লান মুখচ্ছবি। আর শুনতে অবাক লাগে, সেই মুখগুলিই শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের প্রেরণা জোগায়, জোগায় উৎসাহ। ভাই, দেশব্যাপী আজ ভাঙনের পালা চলেছে। ভাঙন আর ভাঙন। কিন্তু তাতে হতাশ হলে তো চলবে না। প্রতিটি ক্রিয়ারই প্রতি-ক্রিয়া আছে। এই ভাঙনের মাঝে কোথাও নিশ্চয়ই চলেছে গঠনের কাজ। আজ তা আমাদের অপ্রত্যক্ষ অগোচর। কিন্তু একদিন তা প্রত্যক্ষ হবেই, আমরা জানবো তার দীপ্ত আবির্ভাব। এই আশার বাণী শোনাবার জন্যই এসেছে কিশোর ভারতী. এটাই তার আত্মপ্রকাশের অন্যতম কারণ। তোমাদের ঘিরে কিশোর ভারতীর সাধ অনেক কিন্তু বিরুদ্ধ পরিস্থিতির চাপে সাধ্যে কুলোয় না সবটুকু। তবু মনে রেখ, তোমাদের জন্য কিশোর ভারতীর শুভকামনা ও ভালবাসার অন্ত নেই, তোমাদের সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত সে চলবে তোমাদেরই নিজস্ব পত্রিকা হিসাবে তোমাদের প্রিয়তম বন্ধু ও সাথী হয়ে।

নৈহাটি থেকে **বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী** লিখেছে ঃ

প্রিয় সুজনবন্ধু, তোমাকে ভালবাসা জানিয়ে চিঠি শুরু করছি। আমার এক বন্ধুর কথা বলি। সে গত স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিল। যেদিন পরীক্ষার ফল বেরুল, সেদিন দেখা গেল, বন্ধুটি তিন বিষয়ে ফেল করেছে। অথচ এই তিনটি বিষয়েই তার জ্ঞান ছিল সত্যই গভীর, সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী। কি ব্যাপার, বলতে পার? এর কি কোন প্রতিকার আছে? বন্ধুটির আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়, তার দেহ-মন ভেঙে পড়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, তারপর সে যখন নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে আবার পরীক্ষা দেবার জন্য নতুনভাবে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে ইংরেজী-বাংলার সিলেবাস দেখতে গেল, তখন সিলেবাস দেখেই তার মাথা গেল ঘুরে। কেন না কোর্স সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে—আরো বেশী নতুন গল্প, আরো বেশী নতুন কবিতা দেওয়া হয়েছে। কেমন করে সে এই অল্প সময়ের মধ্যে কোর্স কমপ্লিট করবে, তাই ভেবেই বন্ধুটি আকুল।......আমাদের Board of Secondary Education-এর এ কী রসিকতা? ছেলেদের জীবন নিয়ে এ কী নিষ্ঠুর খেলা আর প্রবঞ্চনা? আমরা কিশোর, এর প্রতিকার, এর জবাব চাই সরকারের কাছে। বছর বছর বই বদলানোর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের এই হীন পথ, কদর্য উপায় তাঁদের শীঘ্রই ত্যাগ করতে হবে।

ভাই বৈদ্যনাথ, তোমার বন্ধুর দুর্ভাগ্যের কথা পড়ে বেদনা বোধ করেছি। তেমনি আবার সে তৈরী হচ্ছে জেনে আনন্দও পেয়েছি। এই তো চাই। ব্যর্থতায় যে একেবারে ভেঙে পড়ে, তার পক্ষে জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়া দুরূহ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনের এটাই

সবচেয়ে বড় শিক্ষা। প্রতিকূল অবস্থা ও ব্যর্থতার বিরুদ্ধে যুঝে তাঁরা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছেন।

তোমার পত্রের প্রথম অংশ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা মুশকিল। ভুল বা অন্যায় যে হচ্ছে না তা নয়। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে তার ছিটেফোঁটা প্রকাশও পাচ্ছে। তোমার বন্ধুর ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটেছে কিনা কে বলবে! ওটা তদন্তসাপেক্ষ। বর্তমান ব্যবস্থায় সে তদন্ত কিভাবে সম্ভব, তাও জানি নে।

তোমার দ্বিতীয় অভিযোগ কিন্তু অত্যন্ত গুরুতর। বই বিক্রির জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ যদি বছর বছর কোর্স বা সিলেবাস পালটানোর পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন, তবে তা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। এটা দুর্নীতি। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, পর্ষতের নীতি হলো তিন বা চার বছর অন্তর সিলেবাস পালটানো। এই নীতি অনুসারে যে বছর কোর্স পালটানোর কথা, তোমার বন্ধু হয়তো দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বছরের কোর্সই দেখেছে।

যাই হোক, এ বিষয়ের প্রতি আমরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় তাঁরা এ সম্পর্কে অবিলম্বে আমাদের ওয়াকিবহাল করবেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা কি জান? বড় কথা হলো, শিক্ষাক্ষেত্রে যে অচলায়তন চেপে আছে, তার এখানে ওখানে টুকিটাকি সংস্কার বা চুনকামের দ্বারা কোন কাজ হবে না, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ ও অকল্যাণ বাসা বেঁধেছে, তার সমূল উৎপাটন ছাড়া ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক করো নিস্তার নেই।

কলিকাতা-৪০ থেকে **শেখর গঙ্গোপাধ্যায়** লিখেছে :

ভাই সুজন বন্ধু, সেদিন দুপুরবেলায় শুয়ে আছি, এমন সময় কানে এলো কে যেন ডাকছে, বাড়ীতে কে আছেন? জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি যে আমাদের স্কুলের পুরনো একটি ছেলে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ডাকছে। ছেলেটির মুখ চিনতাম, কিন্তু আলাপ ছিল না। কাজেই একটু বিস্মিত হয়েই বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমাকে দেখে সে জিজ্ঞেস করলে, তোমরা চা খাও তো? বিস্মিত ভাবে জানালাম, হ্যাঁ। কোন্ কোম্পানীর চা খাই জানতে চাওয়ায় তা-ও বললাম। তখন সে আমার হাতে তিন-চার প্যাকেট চা দিয়ে বললে, এটা খুব ভালো চা। ঘরে গিয়ে মাকে সব বলে চায়ের প্যাকেটগুলো দিলাম। মা তখন বাইরে এলেন। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, সে এখন সিটি সাউথ কলেজে পড়ে। দু জায়গায় প্রাইভেট টিউশনি করে, আর করে এই চা বিক্রি।

চা খুব ভালো না হলেও মা চা রাখলেন এবং তাকে সামনের মাসে আবার আসতে বললেন।

ছেলেটিকে আমার এত ভালো লাগলো যে, তোমাকে চিঠি না লিখে পারছি না। আমার মনে হয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যদি ছেলেটিকে দেখতেন, তবে খুব খুশী হতেন। দেশের শোচনীয় দুরবস্থা এবং বেকার-সমস্যার জন্য কেবল অভিযোগ না করে, এই ছেলেটির মতো স্বাবলম্বী হয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা বোধহয় অনেক ভালো।

ভাই শেখর, তোমার অভিজ্ঞতার মিষ্টি কাহিনীটুকু পড়ে বড় ভাল লাগলো। ছেলেটির স্বাবলম্বী হবার এই প্রয়াস ও পরিশ্রম নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এবং তোমার সংগে একমত হয়ে বলছি, যারা বেকার বা স্বল্প-উপার্জনকারী, তাদের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে বা হা-হুতাশ না করে ছেলেটির কর্মোদ্যমকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

কিন্তু ভাই, সেই সংগে উচিত আরো একটা কথা মনে রাখা। আমাদের দেশে এভাবে উপার্জন করার সুযোগ কতটুকু বর্তমান, তা ভেবে দেখা দরকার। উদাহরণ হিসাবে টিউশনির কথাটাই ধরা যাক। যেমন তেমন একটা টিউশনি যোগাড় করাও আজ কতখানি কষ্টকর, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। কাজ যেখানে অল্প ও সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রার্থী অগণন, সেখানে এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। একজন ছাত্রের পক্ষে কিছু দিনের জন্য ঐভাবে পড়াশোনার খরচ সংগ্রহ করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু ঐভাবে পরিবার প্রতিপালনের মতো রসদের সংস্থান করা কি সম্ভব সকলের পক্ষে—বিশেষতঃ আমাদের দেশে, যেখানে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকুচিত এবং দিন দিন আরও সঙ্কুচিত হচ্ছে, অথচ অর্থোপার্জনেচ্ছুক কর্মহীনের সংখ্যা প্রায় অগণিত এবং দিন দিন তা অতি দ্রুত আরও বৃদ্ধির পথে? আমাদের মতো দেশের অধিকাংশ মানুষই যেখানে গরীব, নিজের পরিবারের জন্য দু মুঠো অন্নের সংস্থান করতেই যাদের প্রাণান্ত হবার যোগাড়, তাদের পক্ষে উদারতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য দেখান কদিন সম্ভব, সেটাও মনে রাখা দরকার। দেশ আজ যেদিকে চলেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতার সংখ্যা বেশী দাঁড়ান বিচিত্র নয়।

চিত্রের এই দিকটা কেন তুলে ধরলাম, জান? তুলে ধরলাম এই জন্য যে ছেলেটির উৎসাহ-উদ্যমকে যেমন অভিনন্দন জানান উচিত, তেমনি আবার বর্তমান নিষ্ঠুর বাস্তব অবস্থাটাও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। অতীতের সংগে তুলনা করবার সময় এটা কিন্তু আমাদের কখনই ভুললে চলবে না।

শব্দ-হেঁয়ালি

পরিচালক ঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই সংখ্যায় কয়েকটা ধাঁধা দেওয়া হল। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ২৮-১-৭০।

আগামী সংখ্যায় এই ধাঁধাগুলোর উত্তর প্রকাশিত হবে।

১। নিচেরটা বলতোঃ—
তীর ভারশো কি?

২। মজার সে এক, দোলের দিনে
সদাই থাকে ব্যস্ত,
মাথাটা তার কেটে দিলেই
বীর হয়ে যায় মস্ত।
মাথাটা আর লেজটা তো রোজ
আরশিতে যায় দেখা,
একটু ভাবো, নামটি তাহার
নয়কো কঠিন লেখা॥
[সৈয়দ আহসান জমিল, মুর্শিদাবাদ]

৩। কোন এক বিদ্যালয়ে একদিন এক পরিদর্শক এসে ছাত্রদের বুদ্ধির পরীক্ষা নেবেন, ঠিক করলেন। তিনি তাদের দুটো বাক্স দেখিয়ে বললেন, "এই দুটো বাক্সের একটার মধ্যে একটা কলম আর অপরটিতে একটা বই আছে। তোমরা এক এক-জন করে আমার কাছে এসে একটি মাত্র প্রশ্ন করতে পারবে। আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে একবার সত্যকথা বলব এবং তার পরের বার মিথ্যেকথা বলব। আর, একজন যখন প্রশ্ন করতে আসবে তখন অপর সকলে ঐ প্রশ্ন এবং তার উত্তর শুনতে পাবে না। একটিমাত্র প্রশ্ন করে এবং আমার কাছ থেকে তার উত্তর শুনে তোমাদের মধ্যে কেউ কি বলতে পারবে—কোন্ বাক্সে কি আছে?"

ছাত্রদের মধ্যে একজনই মাত্র সঠিক উত্তর দিতে পারল। তোমরা বলতে পার, ঐ ছাত্রটি কি প্রশ্ন করেছিল এবং কিভাবে উত্তরটা দিল? [ইন্দ্রজিৎ সরকার ও অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, চিত্তরঞ্জন]

গত কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'শব্দ-হেঁয়ালি'র উত্তরদাতাদের নাম

সবগুলোই নির্ভুল

বেবী, ছবি, তাপস, মানস, টুম্পা ও টুকটুকী, ডিম-ডিমা চা বাগান; রত্না, স্বপ্না, কৃষ্ণা, রুবা ও সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, হাওড়া; চতুরকুমার কবিরাজ, দুবরাজপুর; কুশল সেনগুপ্ত, নূতনগঞ্জ; আশিস্ কুমার দত্ত, কলিকাতা ৫৪; ধ্রুব চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগর; অঞ্জু, মিঠু, বাবু, শিমুল ও ও ছোটো, কলিকাতা ২৬।

গত মাসের উত্তরদাতাদের নাম

সবগুলোই নির্ভুল

দেবীকুমার আদক, পুইনান; আশিসকুমার চ্যাটার্জী, দুর্গাপুর ৩; ঋত্বিক, শিশুতোষ ও মনতোষ চন্দ, নবদ্বীপ; তপনবরণ রায়, নৈহাটী; শুভাশিস নিয়োগী, কলিকাতা ১৪; অর্চনা ঘোষ, মদনপুর; তপন মজুমদার, রানাঘাট; শ্যামলকুমার চ্যাটার্জী, কলিকাতা ৬; গঙ্গাধর মহান্তি, সোনামুখী; রবীন্দ্রকুমার পাকড়াশী, বহরমপুর; অপূর্ব সেন, ময়নাগুড়ি; অজয়কুমার দত্ত, কলিকাতা ৪৭; দেবাশীষ মুখার্জী, শ্রীরামপুর; কঙ্কণা কুণ্ডু, সুজাগঞ্জ; আশিস-

কুমার দত্ত, কলিকাতা ৫৪; কল্যাণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা ২৬; মহম্মদ কামাল হোসেন, বহরমপুর; গৌতম বল, কাকিনাড়া; দেবাশীষ সাহা, দমদম এয়ারপোর্ট; তাপস, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও তাদের ভাগ্নে, হাওড়া ৬; সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৬; শুভ্রাংশু ভৌমিক, কলিকাতা ৪৫; তন্ময় সাহা, কাটোয়া; অলক চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি; বিনতা ও শ্বেতা রায়, কৃষ্ণনগর; তপনজ্যোতি মিত্র, বেলগাছিয়া; কুশল সেনগুপ্ত, নূতনগঞ্জ; সোমনাথ, নীলকান্ত ও মনোজ মুখোপাধ্যায়, হুগলী; মৃণালকান্তি ও জয়শ্রী সেনগুপ্ত রায়গঞ্জ; অলোককৃষ্ণ সেন, কৃষ্ণনগর; রাণু হাজরা, হাওড়া ৬; শুভব্রত ও কল্পনা দাশগুপ্ত, বর্ধমান; শোভা ঘোষ, হুগলী; অসীমা ও অমিত দাস, কলিকাতা ১২; শুভা, এলা, প্রভাতরঞ্জন, ধ্রুবরঞ্জন ও চিত্রা হালদার, কোন্নগর; প্রিয়ব্রত রায়, বাসুদেবপুর; অতুলকুমার মাইতি, চন্দনপুর-হাট; প্রণবকৃষ্ণ চন্দ, কৃষ্ণনগর; তুষার, তরুণ, তাপস, মৃণাল বারিক ও বিভূতি বৈরাগী, আউসবেড়িয়া; সমিত ও অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৯; ভাস্কর দাশ, চক্রধরপুর; অমিতকুমার ও গৌতম দে, কলিকাতা ৩৬; তরুণকান্তি, তুষারকান্তি ও পাপিয়া চট্টরাজ, ডায়মন্ডহারবার; বিমানচন্দ্র নিয়োগ, কৃষ্ণনগর; তাপসকুমার গোস্বামী, কলিকাতা ২; বিকাশ ঘোষ ও দুলাল রায়; শংকরলাল সাহা, শ্রীরামপুর; বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গৌতম বড়ুয়া, কুচবিহার; শরদিন্দু ভড়, কলিকাতা ৬; অলক, অজয়, উৎপল, অশেষ, অনুশ্রী, কল্পনা ও পরী মাইতি, হাঁসচড়া; বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৯; গৌতম সেনগুপ্ত, কলিকাতা ৪; সৌমিত্র সিংহ, গড়িয়া; অভিজিৎ দাস, কলিকাতা ৬; অসীমকুমার দেবরায়, উপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী রোড; সুতপা ধর, কলিকাতা-২৬; সুরজিৎ রায়, কলিকাতা ৬ প্রদীপকুমার দাস, মালদহ; কণিকা, মানস, তাপস, ছবি ও বেবী, ডিমডিমা; বিতানকুমার ঘোষ, প্রসন্ননগর; সুবলচন্দ্র রায়, রাণীগঞ্জ; গুণধর পাল, দাঁতন; দেবাশীষ ব্যানার্জী, খড়্গপুর; সুদামচন্দ্র রায়, দুর্গাপুর; বিজনবন্ধু ঘোষ, কোদালিয়া; ভক্তিপদ কর্মকার, পলাসণ; শান্তনু ঘোষ, কলিকাতা ৫২; কুণাল ভট্টাচার্য কলিকাতা ৬; আনন্দস্বরূপ ব্যানার্জী ও ক্ষেমেন্দ্র মজুমদার, শিলদা; সুভাষচন্দ্র দারুকা, বাঁকুড়া; কল্যাণব্রত বিশ্বাস ও কল্যাণ মৈত্র, নব বারাকপুর; অসিতকুমার দে, কলিকাতা ৯; স্বাতী মিত্র, ভদ্রকালী; মহুয়া, সোমপ্রকাশ ও মন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ২০; উত্তমকুমার বটব্যাল, মালিয়াড়া; বৈদ্যনাথ, সোমনাথ, মানসী ও শেফালী চক্রবর্তী, নৈহাটী; চিন্ময় সেনগুপ্ত, ঝাড়গ্রাম; ভুপেন চন্দ্র দে, গোকর্ণ সৌমেন্দ্রনাথ কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, নবাবগঞ্জ; সঞ্জিতকুমার সিংহ, কলিকাতা ২৫; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, বোরহাট; ষষ্ঠীকুমার, শ্যামাপদ, হরেকৃষ্ণ, মানারাম দাস ও আরো অনেকে, সোনামুখী বাবুপাড়া; নির্মাল্য, সাধন ও তাদের বাবা এবং মা, কুচবিহার; অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, লধুড়কা; সুমিতা সরকার, দীপিকা বসু ও রুমা সরকার, গোবরডাঙা; টাইনি নায়ার, দুর্গাপুর ৫; মিতা মুখোপাধ্যায়, চন্দনা পাল ও স্নিগ্ধা বসু; টাবুগোপাল ও পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, ভাটপাড়া; পরিতোষ সাহা, আলিপুর-দুয়ার জং; বিদ্যুৎ, নীরেন, সুবীর, প্রদ্যুৎ, সাধন ও অসীম, লধুড়কা; অরূপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মসাগ্রাম; কর্মজিৎ বসু, কলিকাতা ৯; শান্তিময় কংশবণিক, নবদ্বীপ; প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৯; শিশির বসু, শিলিগুড়ি; বেণুরঞ্জন দাস, পাণিহাটী; স্বপনকুমার দাস, বেলদা; স্বপনকুমার মাইতি, নারান্দা; শিশিরকান্তি রায়নাথ, ডিমডিমা চা বাগান; শান্তিময় দত্ত, কলিকাতা ২৮; সনৎকুমার মুখাজী, কলিকাতা ২৬।

গত মাসের 'সাহিত্য-ধাঁধা'র উত্তর

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র, (খ) ঈশ্বরচন্দ্র, (গ) নজরুল, (ঘ) রবীন্দ্রনাথ, (ঙ) মধুসূদন, (চ) অবনীন্দ্রনাথ, (ছ) শরৎচন্দ্র, (জ) বিভূতিভূষণ, (ঝ) প্রমথ চৌধুরী, (ঞ) রামেন্দ্রসুন্দর, (ট) বিবেকানন্দ, (ঠ) রবীন্দ্রনাথ, (ড) জগদীশচন্দ্র, (ঢ) নবীনচন্দ্র সেন, (ণ) দ্বিজেন্দ্রলাল।

কার্তিক মাসের ''শব্দ-হেঁয়ালি''র উত্তর

১ মী	২ র	৩ ব	৪ হ	র	■	৫ হ	৬ র	৭ ক	৮ ত
৯ র	হ	মা	ন	■	১০ প	রি	স	ম্প	ৎ
১১ ম্ব	স	ল	■	১২ ত	ল	তা	■	■	প
ন	■	■	১৩ গৃ	হ	■	১৪ লি	১৫ পি	১৬ ক	র
১৭ শী	১৮ ধু	■	১৯ হ	বি	■	২০ কা	ত	র	■
■	২১ ন	২২ ভ	স্থ	ল	■	■	২৩ ল	ক	২৪ ট
২৫ প	ন	স	■	■	২৬ মু	থা	■	২৭ ম	ই
মে	■	২৮ কা	২৯ ম	৩০ স	খ	■	৩১ উ	ল	ট
৩২ ট	৩৩ ল	■	৩৪ দ	হ	র	৩৫ ম	■	■	ম্বু
৩৬ ম	জ্জা	গ		■	■	৩৭ র	ত্না	ক	র

স্বপ্নলোকের চাবি

মনোরঞ্জন ঘোষ

[**রূপ-রঙ্গ**—নতুন আর একটি বিভাগ। নানা কারণে এত দিন খোলা সম্ভব হয় নি। কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছি প্রতিদিন।

এই বিভাগে থাকবে যাত্রা, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতির কথা। থাকবে এ সবের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা। কখনো বলা হবে তাদের কোন-কোনটার সামগ্রিক ইতিবৃত্ত, কখনো বলা হবে তাদের বিভিন্ন দিকের কাহিনী, কখনো বা থাকবে কোন নামকরা বইয়ের আলোচনা। তেমনি স্বনামধন্য নাট্যকার, অভিনেতা বা পরিচালক-প্রযোজকের কথাও শোনান হবে মাঝে মাঝে।

যাত্রা, চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি শিল্পকলার প্রভাব আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কতখানি দূরপ্রসারী, তা বোধহয় বলার দরকার করে না। আমাদের জীবনে এরা রসের ও আনন্দের দিক, তেমনি শিক্ষার দিকও বটে। জীবনের সঙ্গে এদের যোগ নাড়ীর যোগ, যা অবিচ্ছেদ্য। চলার পথের অনেকখানি শক্তি ও পাথেয় আমরা জোগাড় করতে পারি এদের মধ্য থেকে। সেদিক থেকে এদের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এইসব শিল্পকলা যেমন সমাজের কল্যাণ ও অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে, তেমনি পারে তার অন্তরায় হতে। সত্য, শিব ও সুন্দরকে তারা আবাহন করবে, না তাদের বিসর্জনের বাহন হবে, তা কিন্তু এইসব শিল্পকলার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে দেশের তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ওপর আর যারা তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে তাদের ওপর। অত্যধিক মুনাফার লালসা ও সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন যেখানে মুখ্য, সেখানে অসত্য, অশিব ও অসুন্দর যদি প্রাধান্য পায়, তাহলে আশ্চর্য হবার কি আছে?

তাই এইসব শিল্পকলার কথা আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। কিন্তু সব আলোচনাই করা হবে সরস ভাষায়—গল্পের মতো করে।—**সম্পাদক**]

"...**তেপান্তরের** মাঠে পক্ষীরাজ ছুটছে...ছুটছে...ছুটছে...

হাড়ের পাহাড় কড়ির পাহাড় ডিঙিয়ে ঘুমতি নদী পেরিয়ে অচিন দেশের রাজকুমারকে পিঠে নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া শেষে এল স্বপনপুরে। সেখানে শ্বেত পাথরের প্রাসাদে যার কুচবরণ কন্যা মেঘবরণ কেশ সেই ময়নামতী সোনার খাটে গা আর রুপোর খাটে পা রেখে ঘুমায়। ঘুমপরীরা প্রজাপতির পাখা তার দু চোখে বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে গেছে......"

দুম্ করে একটা আওয়াজ হয়। মিণ্টুর মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে যায়। ঠাকুরমার গল্প বলা বন্ধ হয়ে যায়। বাদলা রাতে লণ্ঠনের আলোয় ঠাকুরমাকে ঘিরে বসে নাতি-নাতনীর দল এক মনে গল্প শুনছিল। শুনতে শুনতে মিণ্টুর ঢুলুনি এসে গিয়েছিল।

ভণ্টু বলে, ঠাক্‌মা, তোমার রূপকথা শুনতে শুনতে মিণ্টুও মনে মনে ঘুমপরীদের কাছে চলে গিয়েছিল। পরীদের সঙ্গে তোর কেমন আলাপ হলো রে, মিণ্টু?

ভণ্টুর টিট্‌কারিতে রেগে গিয়ে মিণ্টু বলে, তোর মতো গাধাই এমন প্রশ্ন করবে। স্বপনপুরী শুধু গাঁজাখুরি। পরীরা সত্যি করে নেই। তেপান্তরের মাঠ কোন মানচিত্রে নেই। পক্ষীরাজ পিঠে করে রাজপুত্রকে কোথাও নিয়ে যায় না। সব মিথ্যে!

দাদার মতো বাস্তববুদ্ধি এখনও ভণ্টুর হয়নি। সে যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। তাই ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ, ঠাক্‌মা, তোমার গল্প সত্যি নয়? রূপকথার দেশ কি কোথাও নেই?

ঠাকুরমাও হয়তো সঠিক জানেন না রূপকথার দেশ আছে কিনা। শিশুর সুরে সুর মিলিয়ে কল্পনাপ্রবণ কবিও জিজ্ঞাসা করেছেন—

"স্বপন পারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি,
কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি?"

বর্তমান কালে আমরা কিন্তু খুঁজে পেয়েছি স্বপ্নলোকের চাবি। আমাদের কিন্তু রূপকথার রাজ্যে 'হারিয়ে যাবার নেই মানা।' দু চোখ ভরে আমরা দেখতে পারি অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা। অ্যালিসের সঙ্গে ওয়ান্ডারল্যান্ডে আমরা ঘুরে বেড়াতে পারি, পিটার প্যানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, গ্ল্যাস-স্লিপার পরা সিন্ডারেলার সঙ্গে বল-নাচে আমরাও যোগ দিতে পারি। ভূতের রাজা আমাদের সামনেই গুপী গায়েন ও বাঘা বায়েনকে বর দিয়েছে, হল্লা রাজ্যের হৈ-হল্লা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।

পক্ষীরাজ না হলেও একটি সাধারণ ঘোড়ার সাহায্যেই আমরা 'পরীর দেশে দিই হানা।' রাজার ঘোড়া না হলেও এক রাজ্যপালের ঘোড়াই পৃথিবীর সাধারণ মানুষদের রূপকথার রাজ্যের সীমান্তে পৌঁছে দিয়েছে। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগেকার একটি ঘটনা আমাদের স্বপ্নলোকে সঞ্চরণের সামর্থ্য এনে দিয়েছে। আমেরিকার এক প্রদেশের গভর্নর বাজি ধরেছিলেন বাজীর উপর এবং তার থেকেই শুরু হয়েছিল ভোজ-বাজি—চলচ্চিত্র!

আর এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি রূপকথার রাজ্য।

রূপ ও রঙের সমন্বয়ে যে সিনেমা, তার জন্মকথা এবার তাহলে শোনান যাক।

১৮৭২ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর ছিলেন লেল্যান্ড স্ট্যানফোর্ড। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে এই ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশেই আছে লস এঞ্জেলস, চলচ্চিত্র জগতের স্বর্গলোক—হলিউড। অবশ্য যখনকার কথা বলা হচ্ছে তখন হলিউড গড়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে এখানে ফিল্ম স্টুডিওর পত্তন হয়। একদিন গভর্নর স্ট্যানফোর্ডের সঙ্গে দুই ধনী বন্ধুর তর্ক হয় যে, ঘোড়া যখন কদম চালে দৌড়ায় তখন একবার না একবার জমি হতে তার চারটি পা একসঙ্গে শূন্যে উঠে যায়। গভর্নর লেল্যান্ডের নিজস্ব রেসের ঘোড়া ছিল এবং ঘোড়-দৌড় সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কাজেই তিনি পঁচিশ হাজার ডলার বাজি ধরেন, ধনী বন্ধু দুজনও হটবার পাত্র নন। কিন্তু সমস্যা হয় যে, দু পক্ষের কার কথা ঠিক তা প্রমাণ করা যাবে কি ভাবে? তার জন্যও দু পক্ষই প্রভূত অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত হয়।

গভর্নর লেল্যান্ড সেই সময় সরকারী জিওডেটিক সার্ভে বিভাগের কার্যে নিযুক্ত ইয়েডউইয়ার্ড মাইব্রিজ (Eadweard Muybridge) নামে এক ফটোগ্রাফারকে ধাবমান অশ্বের চিত্রগ্রহণ করতে বলেন। তখনকার দিনে এই কাজটা প্রায় অসাধ্য-সাধনের মতো ছিল। তখনও সেলুলয়েডের ফিল্ম আবিষ্কৃত হয়নি, কাঁচের প্লেটে ছবি তুলতে হতো। ক্যামেরা ও লেন্স বর্তমান কালের মতো উন্নত ছিল না। আজকাল চোখের কাছে ক্যামেরা তুলে এক সেকেন্ডের এক শতাংশেরও কম সময়ে যে কোন লোক ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি তুলতে পারে। এই ধরনের 'স্ন্যাপ-শর্ট' তখন ছিল কল্পানাতীত।

যা হোক, মাইব্রিজ তো সেই যুগের সাবেকী ক্যামেরা স্ট্যান্ডে বসিয়ে প্লেট নিয়ে প্রায় হাজার বার চেষ্টা করলেন লেন্সের সামনে দিয়ে ঘোড়ার ছুটে যাবার সময় ছবি নেবার। কিছুতেই ঠিক সময়ে 'শাটার' টিপে প্রয়োজনীয় এক্সপোজার দেওয়া যায় না। কয়েক শো প্লেট নষ্ট হয়ে একটি দুটি যা ছবি উঠল, তাতে গভর্নরের ধারণাটা ঠিক বলে মনে হলেও জোর গলায় অভ্রান্ত বলা চলে না। প্রতিপক্ষও ও ধরনের ছবির ভিত্তিতে পরাজয় স্বীকার করবে না, বিশেষ করে বাজির অঙ্ক যেখানে সামান্য নয়।

মাইব্রিজ বোঝেন, এ রকম দু একটা ছবিতে হবে না, ছুটন্ত ঘোড়ার একটানা ছবি চাই। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি মাথা খাটিয়ে এক বুদ্ধি বের করলেন। পর পর যদি চব্বিশটি ক্যামেরা সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা হয় ঘোড়াটির দৌড়ে যাবার পথের পাশে এবং প্রতিটি ক্যামেরার শাটারের সঙ্গে সুতো বেঁধে অন্য পাশে এক সারি গ্রাফ-আঁকা সাদা বোর্ডের সঙ্গে আটকে রাখা যায়, তাহলে ঘোড়াটা যখন দৌড়ে যাবে তখন তার বুকে লেগে সুতোগুলি একটার পর একটা ছিঁড়ে যাবে এবং এইভাবে পর পর চব্বিশটি ছবি উঠে যাবে। বোর্ডের গায়ে গ্রাফ আঁকা থাকার ফলে প্রতিটি ভঙ্গির সময় ঘোড়াটার পা মাটি থেকে কতটা উপরে উঠেছে তার একটা সুস্পষ্ট আভাসও পাওয়া যাবে।

মাইব্রিজের এই প্ল্যানটি অন্যদের মনঃপূত হয়। কিন্তু একে কার্যকরী করতে গিয়ে মুশকিল বাধে। ঘোড়াটা পথের মাঝখানে ওই সব সুতো-টুতো দেখে

ভড়কে যায়; দু একটা সুতোর স্পর্শ যেই তার বুকে লাগে অমনি দৌড় বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। যা হোক, অনেক করে তো ঘোড়-দৌড় করান গেল এবং মোটা-মুটি কয়েকটা ছবি তোলাও গেল। কিন্তু আরও ভাল পরিষ্কার ছবি এই পদ্ধতিতে তোলা দরকার।

স্ট্যানফোর্ড এই ব্যাপারে মাইব্রিজকে সাহায্য করার জন্য জন এফ আইজ্যাকস নামে এক যুবক ইঞ্জিনি-য়ারকে নিযুক্ত করলেন। তিনি 'ইলেকট্রিক বেল-পুশ' ধরনের এক যন্ত্র দ্বারা ক্যামেরার শাটারগুলি সক্রিয় করার ব্যবস্থা করলেন, যাতে ঘোড়ার দেহের সংস্পর্শে সেগুলি কার্যকরী না হলেও তার গতিভঙ্গীতে হবে।

এই পদ্ধতিতে সাফল্যের সঙ্গে ধাবমান অশ্বের পর পর চব্বিশটি ছবি তোলা গেল। গভর্নর স্ট্যানফোর্ড বাজি জিতলেন। কিন্তু তাঁর বাজি জেতার চেয়েও বড় ব্যাপার ঘটল—স্থির-চিত্রের বদলে এল চলচ্চিত্র। গতিশীল কোন প্রাণী বা বস্তুর চিত্রগ্রহণ এত দিন অসম্ভব মনে হতো, এবার তা সম্ভব হলো। স্ট্যানফোর্ড ও মাইব্রিজের কাছে যেন এক নতুন জগতের দুয়ার খুলে গেল। স্ট্যানফোর্ড বাজি জিতে যত টাকা পেলেন, তার প্রায় দ্বিগুণ ব্যয় করলেন দুনিয়ার যত গতিশীল প্রাণীর ছবি মাইব্রিজকে দিয়ে তোলাতে।

প্রাণীদের গতিভঙ্গীর ছবি তো তোলা গেল, কিন্তু তারপর আর এক সমস্যার সম্মুখীন মাইব্রিজকে হতে হলো। ছবিগুলিকে কি ভাবে প্রদর্শন করা যায়? ধীরভাবে এক একটি করে ছবি দেখলে এর তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে না। আজকালকার মতো চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্যে 'প্রোজেক্টার' যন্ত্র তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তখন চলছে ম্যাজিক লণ্ঠনের যুগ। ম্যাজিক লন্ঠনে এক একটি করে স্লাইড দিয়ে পর্দার উপর তাই দর্শকদের দেখান হতো, যেমন এখন আমরা সিনেমা-হলে ইন্টারভ্যালের সময় নানা ধরনের বিজ্ঞাপনের ছবি দেখি।

মাইব্রিজ অনেক মাথা খাটিয়ে ওই ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়েই চলচ্চিত্র প্রদর্শনের এক উপায় উদ্ভাবন করেন। ম্যাজিক লণ্ঠন ধরনেরই একটি যন্ত্র তিনি প্রস্তুত করলেন, যার দ্বারা একটি একটির বদলে খুব তাড়া-তাড়ি অনেকগুলি ছবি দেখান যেতে পারে। এটির নাম দিলেন 'জুপ্রাক্সিস্কোপ'। সহজ কথায় বলতে গেলে জুপ্রাক্সিস্কোপ হচ্ছে এমন এক ধরনের ম্যাজিক লণ্ঠন যার স্লাইডগুলি ১৫″ ব্যাসের এক কাঁচের চক্রে সংলগ্ন এবং এই চক্রের সামনে আর একটি ঠিক ওই মাপের অনচ্ছ (opaque) চক্র আছে। এই দ্বিতীয় চক্রটিতে প্রদর্শনযোগ্য ছবির মাপ অনুযায়ী ঘর কাটা আছে। প্রদর্শনের সময় দ্বিতীয় চক্রকে প্রথম চক্রের বিপরীত দিকে ঘোরান হয়। ফলে পর্দায় যে ছবিগুলি প্রতিফলিত হয় সেগুলি অচলভাবে না পড়ে কিছুটা সচল হয় এবং প্রতিটি ছবির মাঝে একটুক্ষণের অন্ধ-কারময় বিরতিও থাকে। আজকের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ধারে কাছে এটি না এলেও মোটামুটি থিয়োরীর দিক দিয়ে এটি ঠিক ছিল এবং দর্শকদের স্থির চিত্রের বদলে গতিশীল চিত্রের আভাস দিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে মাইব্রিজের ধাবমান অশ্বের প্রথম তোলা চব্বিশটি চিত্রের মতোই আজও আমরা চব্বিশটি করে চিত্র (ফ্রেম) এক সেকেন্ডে দেখি আধুনিক প্রেক্ষাগৃহে।

মাইব্রিজ যে যন্ত্রগুলি প্রস্তুত করেন সেগুলি তাঁর জন্মস্থান ইংল্যান্ডের সারে জেলার কিংসটন-অন-টেমসের মিউজিয়ামে আজও সংরক্ষিত আছে।

মাইব্রিজ যে অসংখ্য প্রাণীর ছবি তোলেন, সেগুলির বিভিন্ন অ্যালবাম করে তিনি বিক্রয় শুরু করেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। সারা দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে প্রাণীদের গতিভঙ্গী সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকার করেন। বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসে। ১৮৮০ সালে লন্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউসনে তিনি যে বক্তৃতা দেন, তার শ্রোতাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি রূপে উপস্থিত ছিলেন লর্ড টেনিসন, গ্ল্যাডস্টোন, হাক্সলি ও রাজ-পরিবারের লোকেরা। প্যারীতে তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক আলেকজান্ডার ডুমা।

মাইব্রিজ জীবজন্তুর 'লোকোমোশন' (locomo-tion) সম্পর্কে প্রায় আধ ডজন বই লেখেন। তাঁর এই আবিষ্কারের ফল আর্টের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাহায্য করে। শিল্পীরা প্রাণীদের গতিভঙ্গীর সব ছবি দেখে যথেষ্ট উপকৃত হন।

পরবর্তীকালে আমেরিকার চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীকরা মাইব্রিজের কৃতিত্বকে খুব লঘু করে দেখার চেষ্টা করতেন নিজেদের খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে, যেমন তাঁরা চলচ্চিত্র-আবিষ্কারের গৌরবের আর দুজন দাবীদারকেও অস্বীকার করতেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন ইংল্যান্ডের উইলিয়াম ফ্রিজ গ্রীন আর দ্বিতীয় জন হচ্ছেন ফ্রান্সের লুই ল্য প্রিন্স।

বারান্তরে তাঁদের গল্প শোনাবার ইচ্ছা রইল।

• পরিচালক •
কিশোর বিজ্ঞানী

নিজে করে

রাসায়নিক বাগান

অমরনাথ রায়

এ বাগান সত্যিকারের বাগান নয়। এ বাগানে মাটি নেই, নেই সত্যিকারের গাছপালা। তবে এ কেমনধারা বাগান?—সেই কথাই তো বলব এখন।

কাচের ছোটখাটো একটা চারকোণা পাত্র নাও। ঐ পাত্রের মেঝেতে আধ ইঞ্চি পুরু করে বালি বিছিয়ে দাও। আর তার ওপর বিছিয়ে দাও—ছোট-বড় নানান্ আকারের কতকগুলো নুড়ি পাথর।

বাজার থেকে খানিকটা 'সোডিয়াম সিলিকেট' যৌগ কিনে আন। এটা একটা রাসায়নিক পদার্থ। একে 'ওয়াটার গ্লাস'ও বলা হয়। দু'চামচ ওয়াটার গ্লাসের গুঁড়ো এক কাপ গরম জলে ফেলে চামচ দিয়ে নেড়ে দাও। ওয়াটার গ্লাসের স্বচ্ছ জলীয় দ্রবণ তৈরী হবে। এমনিভাবে তৈরী ওয়াটার গ্লাসের জলীয় দ্রবণ দিয়ে পাত্রটার তিন-চতুর্থাংশ ভরে ফেল। ঐ অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা রেখে দ্রবণটিকে ঠান্ডা হতে দাও।

এবার বাজার থেকে কয়েকটি রঙিন রাসায়নিক দ্রব্যের স্ফটিক যেমন, হরিদ্রাভ-বাদামী রঙের 'ফেরিক ক্লোরাইড' স্ফটিক, হাল্কা সবুজ রঙের 'ফেরাস সাল-ফেট' স্ফটিক হালকা লাল রঙের 'কোবাল্ট নাইট্রেট' স্ফটিক, নীল রঙের 'কপার সালফেট' এবং সাদা রঙের 'জিংক সালফেট' স্ফটিক কিনে আন। তারপর সব রঙের স্ফটিক একটি দুটি করে ঐ কাচের পাত্রের 'ওয়াটার গ্লাস' দ্রবণে ফেলে দাও। পুরো একটা রাত পাত্রটিকে নাড়াচাড়া করবে না।

পরদিন সকালে উঠেই দেখবে যে ঐ কাচ-পাত্রে হরেক রঙের গাছপালা গজিয়েছে এবং তা সুন্দর একটা বাগানের মত দেখাচ্ছে।

ঐ যে রঙিন গাছপালা—ওগুলো সত্যিকারের গাছপালা নয় কিন্তু। ওগুলো আসলে বিভিন্ন রঙিন রাসায়নিক দ্রব্য। এক রঙের রাসায়নিক দ্রব্যের একাধিক কণা একটার সঙ্গে আর একটা যুক্ত হয়ে এক একটি গাছের আকার লাভ করেছে। যেমন ধর, তুঁতের বা কপার সালফেটের স্ফটিক হচ্ছে নীল রঙের। ওয়াটার গ্লাস দ্রবণে যখন ওটা তুমি ফেললে, তখন ওটা ঐ দ্রবণের জলে গুলতে আরম্ভ করল। যতই ওটা গুলতে লাগল ততই 'কপার সিলিকেট' ও 'সোডিয়াম সালফেট' নামক যৌগ দুটি উৎপন্ন হতে লাগল। 'কপার সিলিকেট' যৌগটা নীল রঙের এবং এটা জলে গলে না। এর এক একটি কণা উৎপন্ন হওয়া মাত্রই তুঁতের স্ফটিকের ওপর জমতে লাগল। জমে জমে ডালপালাযুক্ত একটি নীল রঙের গাছের আকার ধারণ করল। অন্যান্য যৌগের স্ফটিক থেকেও এমনিভাবে এক-একটি রঙিন গাছ সৃষ্টি হল এবং রাতারাতি গড়ে উঠল তোমার রঙিন 'রাসায়নিক বাগান'।

এ বাগান তোমার ঘরে রেখে দাও। ঘরের শোভা বেড়ে যাবে।

বইয়ের দুনিয়া

নিরাপদ রায়

ছড়াপিদ্দিম জ্বলে—জ্যোতিভূষণ চাকী ॥ বুকস্ট্যান্ড, ৮১ কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা ১৯ ॥ দাম ঃ দুই টাকা ॥

যুগ যুগ ধরে ঠাকুমা-দিদিমারা মুখে মুখে যেসব ছড়া শুনিয়ে নাতি-নাতনীদের ঘুম পাড়িয়েছেন, ঘুম ভাঙিয়েছেন, পুরনো দিনের হারানো দিনের সেইসব ছড়ার রেশ ও আমেজ আজকাল যেসব ছড়া লেখা হচ্ছে তাদের মধ্যে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। মিষ্টি সেই সুর কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এখন ছড়া নামে যা বেরোয়, তার মধ্যে সাধারণতঃ বুদ্ধির ঝিলিক আছে, ভাষার চমৎকারিত্বও আছে, কিন্তু সেই সুরটিই অন্তর্হিত। হারিয়ে-যাওয়া সেই সুর, সেই রেশ, সেই আমেজ আশ্চর্যভাবে উপস্থিত সম্প্রতি-প্রকাশিত একটি ছড়ার বইয়ে। জ্যোতিভূষণ চাকী রচিত সেই বইটির নামটিও বেশ সুরেলা—'ছড়াপিদ্দিম জ্বলে'।

অপূর্ব সব ছড়া। তাতে যেমন অতীত আছে, তেমনি আছে বর্তমান। পড়তে পড়তে মোহময় স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি হয়, ছবি ভেসে ওঠে একের পর এক। মন যেন আকুলি-বিকুলি করে হারানো দিনের কোন্ এক হারানো সুর ফিরে পাওয়ার জন্যে।

সবশুদ্ধ আঠারোটি ছড়া আছে বইটিতে। এবং কোনটিই অযথা ভারাক্রান্ত নয়, বরং ছড়ার ধর্মানুসারে প্রতিটি ছড়াই যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হওয়ায় পড়বার পরও মনের মধ্যে তার কলিগুলি খেলা করে। সব কটি ছড়াই রসোত্তীর্ণ, তবু তাদের মধ্যে 'কথক ঠাকুর কথা বল', 'কোন কন্যে', 'ছয়টি ভাই ছয় দেবর', 'ইষ্টি কুটুম', 'ও পৌষ', 'সোনাদিঘির পাড়ে', 'টগর ভাই' ও 'রূপসী নদী' বারবার পড়বার মত।

বইটির ছবিগুলিতেও পুরনো দিনের মেজাজ ফুটে উঠেছে। ছবিগুলি এঁকেছেন সীতেশ রায়। ছাপাও সুন্দর। 'ছড়াপিদ্দিম জ্বলে' ছোটদের কাছে যথেষ্ট সমাদর পাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

—**দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

নির্মাল্য [প্রথম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা]—সম্পাদক ঃ মণিলাল খান ও দীনেশচন্দ্র চৌধুরী॥ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া॥

রহড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম-এর 'রজত জয়ন্তী' উৎসব উপলক্ষে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় 'নির্মাল্য' নামে একটি বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের সম্মিলিত প্রয়াসে আলোচ্য প্রথম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যাটি বর্ণে-গন্ধে মনোরম হয়ে উঠেছে। নির্ঝরের উচ্ছ্বাসকে বাঁধ দিয়ে সংযত ও সংহত করার মত কাজ করেছে শিক্ষকদের সুচিন্তিত রচনাগুলি ছাত্রদের লেখার মাঝে মাঝে থেকে। কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-চিত্র-আলোকচিত্র ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের বিপুল সমাবেশে 'নির্মাল্য' তার এই প্রথম আবির্ভাবেই বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে। এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাই॥

ইশারা—মিহির সেন॥ লিপিকা, ৩০/১ কলেজ রো, কলিকাতা ৯ ॥ দাম ঃ দুই টাকা॥

একই ঈশ্বরের পৃথিবীতে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের পরস্পর-বিরোধী অবস্থান ও দ্বন্দ্ব কেন, তারই একটা ইশারা পাওয়া যায় আলোচ্য বইখানিতে। তিন দৃশ্যের ছোটদের এই একাঙ্ক নাটকটিতে সমকালীন শ্রমজীবী মানুষের এগিয়ে যাবার পথের নিশানা আভাসিত। তের-চৌদ্দ বছরের মংলু ওরফে মঙ্গল এক ধনী ব্যক্তির বাড়ির ভৃত্য যার বাবা মারা গেছে এক ধনী মাতালের হাতে আর মা না খেতে পেয়ে। মংলুর মনে সবসময় এক জিজ্ঞাসার জ্বালা—অধিকাংশ গরীবদের জীবনে এত কষ্ট কেন? এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজে খুঁজে সে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে, সহসা তার সামনে অজানা এক দুনিয়ার দরজা খুলে ধরে ইতিহাস-বুড়ো। ছোটদের জন্যে লেখা হলেও 'ইশারা' পড়ে বড়রাও অনুপ্রাণিত হবেন বলে আমাদের ধারণা। এই ধরনের নাটক তিনি আরো লিখুন, নাট্যকারের কাছে আমাদের এটাই কামনা॥

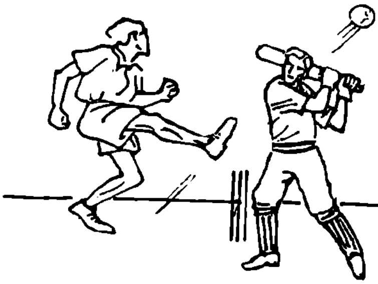

খেলাধুলা

ব্যাটিং করার গোড়ার কথা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্ুটবল খেলায় যেমন আগে গোল বাঁচাও তারপর গোল করো, কুস্তিতে যেমন আগে নিজেকে রক্ষা করো তারপর প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করো—ক্রিকেট খেলাতেও তেমনি সবার আগে জানতে হবে নিজের উইকেট রক্ষা করার কায়দা। নিজের উইকেটই যদি না রক্ষা করতে পারি, খেলতে নেমেই যদি আউট হয়ে যাই, তাহলে মেরে খেলে রান তুলবো কি করে! তাই ভালো ব্যাটসম্যান হতে হলে, শিখতে হবে আত্মরক্ষার কায়দাগ্ুলো।

ক্রিকেটের পরিভাষায় আত্মরক্ষাম্ুলক খেলাকে বলা হয় 'ডিফেন্‌সিভ প্লে'। আত্মরক্ষাম্ুলক খেলা আবার দ্ুরকমের—ফরোয়ার্ড ডিফেন্‌সিভ প্লে অর্থাৎ এগিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করা আর ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্‌সিভ প্লে অর্থাৎ পিছিয়ে এসে আত্মরক্ষা করা। ধরা যাক, একটি গ্ুড লেংথ বল (এ সম্বন্ধে গত সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে) ছ্ুটে আসছে উইকেট লক্ষ্য করে। ব্যাটসম্যান বলটা কিছ্ুতেই মারতে পারবে না। মারতে গেলে হয় ক্যাচ তুলে ফেলবে, না হয় তো ফস্কাবে। বলটা আবার এমন জায়গায় পিচ খেয়েছে যে, পিছিয়ে খেলাও ঠিক নয়। পিছিয়ে গিয়ে খেলতে গেলে উইকেটের কাছাকাছি ক্যাচ উঠে যাবার সম্ভাবনা। তাই ঐ বলটা খেলার জন্যে ব্যাটসম্যানকে এগিয়েই যেতে হবে। অর্থাৎ ঐ ক্ষেত্রে উঠবে ফরোয়ার্ড ডিফেন্‌সিভ প্লের প্রশ্ন।

আবার ধরো, এমন একটা বল আসছে, যেটা এগিয়ে গিয়ে খেলা ঠিক নয়, কারণ হঠাৎ সেটা লাফিয়ে উঠে ব্যাটের কোণায় লেগে ক্যাচ উঠে যেতে পারে কিংবা ধরো এমন একটা বল যা একট্ু উঁচু হয়ে আসছে,—এসব ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান আসবে পিছিয়ে অর্থাৎ তখন সেই বলটি ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্‌সিভ প্লের আওতায় পড়বে।

আত্মরক্ষাম্ুলক খেলাই হোক কিংবা মেরে খেলাই হোক—ক্রিকেট খেলার সব থেকে বড় বিষয় হলো বলের লাইনে পা আনা। ব্যাটসম্যান যদি বলের লাইনে পা আনতে না পারে, তাহলে সে কিছ্ুতেই ভালোভাবে ব্যাট করতে পারবে না। কিছ্ু বোঝার আগেই চট করে আউট হয়ে যাবে। তাই বোলার বল করার পর বলটা যে ভাবে এগিয়ে আসছে ব্যাটসম্যানের দিককার উইকেট লক্ষ্য করে, সেই ভাবেই ব্যাটসম্যানকে বলটা লক্ষ্য করে বলের লাইনে প্রথমে পা আনতে হবে, তারপর সামান্য ব্যাক লিফটের পর ব্যাটটা নামিয়ে আনতে হবে।

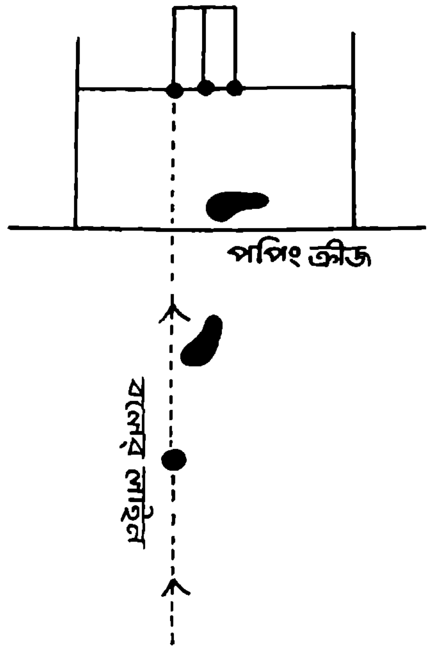

১নং ছবি

এক নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটা গ্ুড লেংথ বলে ফরোয়ার্ড ডিফেন্‌সিভ খেলার সময় বলের লাইনে পা নিয়ে যাবার ভঙ্গিমা। বলটা এগিয়ে আসছে অফ-স্টাম্প লক্ষ্য করে। বল, যে লাইন ধরে আসছে, ব্যাটসম্যান তার বাঁ পাটা সেই লাইনে নিয়ে এসেছে। পাটা সে এমন জায়গায় এনেছে, যাতে বলটা গড়িয়ে এলে তার বাঁ পায়ের জ্ুতোর মাথা হয়তো বা আলতো করে ছ্ুঁয়ে ফেলবে। অর্থাৎ বলের খ্ুব কাছাকাছি তাকে আনতে হবে পাটা। তখন জ্ুতোর মাথা অর্থাৎ বাঁ পাটা

এক্সট্রা কভারের দিকে মুখ করে থাকবে। ব্যাটটাও সামান্য ব্যাকলিফটের পর বাঁ পায়ের সামনে বলের ঠিক ঠিক লাইনে নেমে আসবে। এবার ব্যাটসম্যান বাঁ পায়ের হাঁটু ভেঙে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে। ডান পাটা

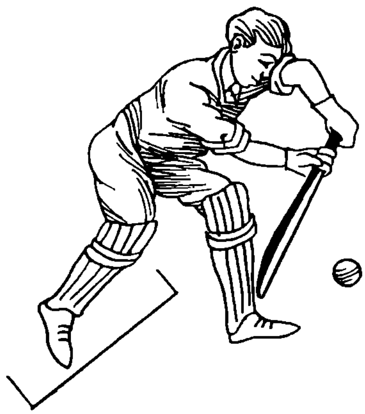

২নং ছবি

কিন্তু যেখানে ছিল, সেইখানেই থাকবে। মাটি থেকে কিছুতেই উঁচু করা চলবে না।

দু নম্বর ছবিতে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলার চরম অবস্থাটা দেখা যাচ্ছে। ব্যাটসম্যানের বাঁ কনুইটা বেঁকে গিয়ে বোলারের দিকে মুখ করে আছে, অনেকের

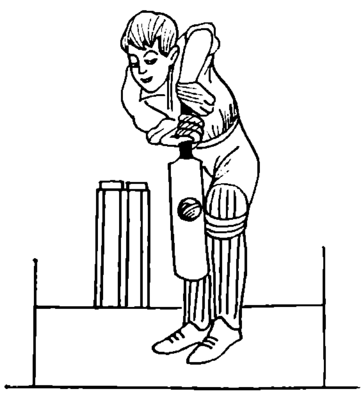

৩নং ছবি

অবশ্য ত্রিকোণও হয়। বাঁ হাত দিয়ে শক্তভাবে মুঠো করে ব্যাটটা ধরতে হবে। ডান হাতের মুঠোটা কিন্তু আলতো হবে। আর খেয়াল রাখতে হবে যে, বলের লাইনে পা আর ব্যাটের মধ্যে যেন ফাঁক না থাকে। কারণ অনেক সময় ব্যাট আর প্যাডের মধ্যের ফাঁক দিয়ে বল গলে গিয়ে উইকেটে লাগে। এ সময় ব্যাট কোন রকমেই ক্রস করা চলবে না—স্ট্রেট ব্যাটে খেলতে হবে।

এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন্ কোন্ বলে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলা খেলতে হয়? যে বলগুলো উইকেটের কিছুটা সামনে পিচ খেয়ে বেঁকে যাবার কিংবা হঠাৎ লাফিয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, সেই বলগুলোতেই ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ প্লে করতে হয়। যেমন অফ ব্রেক, লেগ ব্রেক, ইন কিংবা আউট সুইংগার প্রভৃতি বল।

ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ প্লের পরেই আমাদের জানতে হবে ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্সিভ প্লের অর্থাৎ পিছিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষামূলক খেলার কায়দার কথা। কারণ অফ ব্রেক, গেল ব্রেক কিংবা ঐ ধরনের উইকেটে কিছুটা সামনে পিচ খাওয়া বলগুলো না হয় এগিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষামূলক ভাবে খেলা গেল। কিন্তু শর্ট পিচ বল যেগুলো মারা কষ্টকর, সেগুলোর বেলায় কি হবে? তখন পিছিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলতে হবে।

ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলা হলো ঠিক ফরোয়ার্ড খেলার উল্টোটা। এক্ষেত্রেও বলের লাইনে পা আনতে হবে, তবে এবার কিন্তু ডান পা। ডান পায়ের টো থাকবে অনেকটা পয়েন্টের দিকে মুখ করে। ডান পায়ের ওপর তখন থাকবে সমস্ত শরীরের ভার। বাঁ পাটা ডান পার খুব কাছাকাছি থাকবে। ব্যাটটা এবার ডান

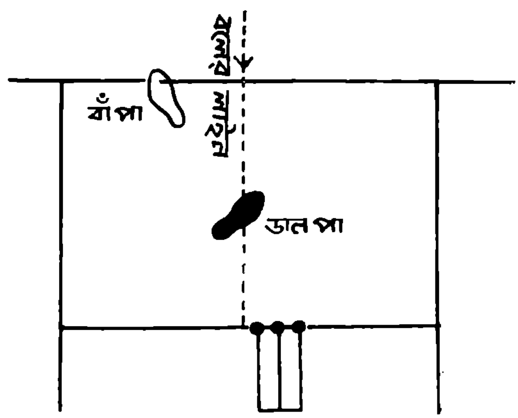

৪নং ছবি

পায়ের প্যাড ঘেঁষে সোজা করে ধরতে হবে লম্বালম্বি-ভাবে। এমনভাবে ব্যাটটা ধরতে হবে যাতে বলটা ব্যাটের ঠিক মাঝখানে এসে আঘাত করে। ব্যাটসম্যানের চোখ থাকবে সব সময় বলের ওপর। আর বাঁ হাতের কনুইটা বেঁকে থাকবে।

ব্যাটটা খুবই হাল্কা ভাবে ধরতে হবে, যাতে বলটা ব্যাটে লেগেই নীচে পড়ে যায়। শক্ত করে ব্যাট ধরলেই বলটা ব্যাটে লেগে ছিটকে যাবে আর সোজা গিয়ে পড়বে উইকেটের খুব কাছাকাছি থাকা ফিল্ডারদের হাতে। এই সময় ব্যাটসম্যানের বুক সাধারণতঃ থাকে কভারের দিকে আর বাঁ কনুই আর বাঁ কাঁধ থাকে বোলারের দিকে। চার নম্বর ছবিতে ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলায় ব্যাটসম্যানের পায়ের এবং তিন নম্বর ছবিতে সমস্ত শরীরের অবস্থাটা দেখানো হয়েছে।

ভালো ব্যাটসম্যান হতে হলে ফরোয়ার্ড আর ব্যাক-ওয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলার কায়দা খুব ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হবে। একদিনে এ কায়দা শেখা সম্ভব নয়—দিনের পর দিন অনুশীলন করতে হবে। ডিফেন্সিভ খেলার বিষয়ে কারো কোন প্রশ্ন কিংবা অসুবিধে দেখা দিলে কিশোর ভারতীতে চিঠি দিলেই তার উত্তর দেওয়া হবে।

খেলার জগতের বিচিত্র খবর ॥ বিশ্বনাথ

খেলোয়াড় পরিচিতি ঃ পাতৌদির নবাব

ভারতের আঠাশ বছরের অধিনায়ক পাতৌদির নবাব ক্রিকেট জগতের বিস্ময়। বছর কয়েক আগে একটা মটর দুর্ঘটনায় পাতৌদি তাঁর ডান চোখটা হারান। সকলেই ভেবেছিলেন যে, পাতৌদি বোধহয় আর খেলতে পারবেন না। কিন্তু শুধু মাত্র বাঁ চোখটার ওপর নির্ভর করে পাতৌদি আজো খেলে চলেছেন। শুধু তাই নয় মাত্র একটা চোখ নিয়ে পাতৌদি যে কি ভাবে অমন সুন্দর ফিল্ডিং করেন, তাও বোঝা দুষ্কর।

১৯৬২ সালে পাতৌদির বয়েস যখন মাত্র ২১ বছর, তখন ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণের সময় ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কনট্রাক্টর আহত হওয়ায় সহ-অধিনায়ক পাতৌদির ওপর পড়লো দল পরিচালনার ভার। সেই থেকে পাতৌদি ভারতীয় দলের অধিনায়ক। সব থেকে কম বয়সে টেস্ট দলের অধিনায়ক হয়ে পাতৌদি রেকর্ড করেছেন।

এ বছরের নিউজিল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার খেলা-গুলো বাদ দিয়ে পাতৌদি মোট ৩১টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এ পর্যন্ত টেস্ট খেলায় তিনি করেছেন ৬টি সেঞ্চুরী। ১৯৬৫ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দিল্লী টেস্ট অপরাজিত থেকে পাতৌদি করে-ছিলেন ২০৩ রান। টেস্ট খেলায় সেইটাই তাঁর সর্বোচ্চ রান। পাতৌদির খেলা বর্তমানে অনেকের মনে সন্দেহ জাগিয়েছে। আলো-আঁধারে কিংবা খেলতে নেমেই, এক চোখে খেলতে হয় বলে পাতৌদি কিছুটা অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন ঠিকই, কিন্তু খানিকক্ষণ টিঁকে থাকলে তাঁর খেলা সত্যিই দেখার মতো। তবে তাঁর ফিল্ডিং আর অধিনায়কতা নিঃসন্দেহে আজো সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

মজার ঘটনা

১৯৪৮-৪৯ সালের কথা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এসেছে ভারত সফরে। মুস্তাক আলী তখন খুব নামকরা ব্যাটসম্যান। তবু দিল্লীর প্রথম টেস্টে তাঁর স্থান হলো না। দ্বিতীয় টেস্ট দলেও চান্স পেলেন না মুস্তাক। কিন্তু খেলার আগে কলকাতায় মুস্তাকের জন্যে শুরু হলো এক আন্দোলন—নো মুস্তাক, নো টেস্ট। ফলে বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ মুস্তাককে দলে নিলেন।

কলকাতা টেস্টের প্রথম ইনিংসে মুস্তাক বিদ্যুৎ গতিতে ৫৪ রান করে আউট হয়ে গেলেন। চোখ ঝলসানো সে খেলা! তবু সন্তুষ্ট হলেন না কর্তৃপক্ষ। তাঁদের একজন বললেন, 'দূর দূর মুস্তাক আর আগের মতো খেলতে পারেন না। ৫৪ রান হঠাৎই করে ফেলেছেন।' ৪১৫ মিনিটে ৪৩১ রান করলে ভারত জিতবে, এমন অবস্থায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলো ভারত। মুস্তাক আর ইব্রাহিম এলেন সূচনা করতে। ৬৬ রান উঠলো ১১০ মিনিটে। খেলার শেষ দিন। ভারতকে জিততে হলে ৩৩০ মিনিটে করতে হবে ৩৬৫ রান। এমন অবস্থায় ইব্রাহিম আউট হয়ে গেলেন। কিন্তু মুস্তাক তখন ধরেছেন সংহার-মূর্তি। দর্শকদের পাগল করে দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই করলেন শত রান তিনি!

সেদিন রাত্তিরে এক ভোজসভায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার প্রিয়র জোন্স বললেন যে, মুস্তাক যদি ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আসেন, তাহলে তাঁকে আমরা পুজো করবো। মুস্তাক সম্বন্ধে যিনি বিরূপ মন্তব্য করে-ছিলেন, তিনিও ছিলেন সেই ভোজসভায় উপস্থিত!

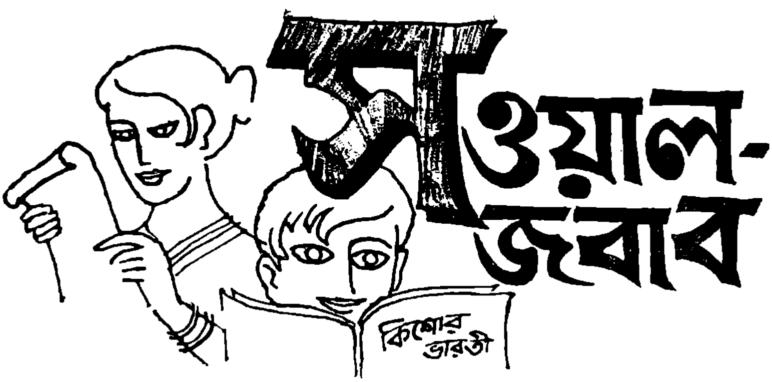

সওয়াল-জবাব

বাণী মৌলিক

ধামতোড় বি· বি. বিদ্যাভবনের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, মেদিনীপুর

—আপনাদের কিশোর ভারতী পত্রিকা যেন সন্দেশ, সবাই খেতে চায়। আমাদের ক্লাশ থেকে চাঁদা তুলে আমরা এই পত্রিকা পাঠ করি। যখন পত্রিকা আসে, তখন সবাই ওটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। মজার গল্পে, কবিতায়, হাস্য-কৌতুকে, নাটকে, খেলাধুলোয়, ধাঁধাহেঁয়ালিতে, নূতন নূতন জানবার কথায় এই পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর।

ঃ পত্রিকাটিকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাওয়ার সন্দেশটিও 'সর্বাঙ্গসুন্দর' সন্দেহ নেই। কিন্তু সবাই যা খেতে চায় সেই সন্দেশতুল্য কিশোর ভারতী কাদের? 'আপনাদের'?

অভিজিৎ দাস, কলিকাতা

—কিশোর ভারতীতে ধাঁধাহেঁয়ালি প্রতিযোগিতার মত সাহিত্য-প্রতিযোগিতা কি আহ্বান করা যায় না?

ঃ কেন যাবে না? তাছাড়া ধাঁধাহেঁয়ালি বিভাগে গত (অগ্রহায়ণ ১৩৭৬) সংখ্যায় যে সাহিত্য-ধাঁধা দেওয়া হয়েছে, সেটাও তো এক ধরনের সাহিত্য-প্রতিযোগিতা।

—পূজা সংখ্যায় যে 'মহাকাশে বোম্বেটে' নামক বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প বেরিয়েছিল, সেরকম গল্প আবার করে পাব?

ঃ তা কি ঠিক বলা যায়? তৈরী হলেই পরিবেশন করা হবে।

শেখর গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা ৪০

—চোখ থাকতেও মানুষ অন্ধ কোথায়?

ঃ আবেগের বশবর্তী হয়ে বিচারবুদ্ধি হারালো। চক্ষুষ্মান্ মানুষও সময় সময় স্নেহান্ধ বা ক্রোধান্ধ হয়।

গোরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া

—গ্রাহক না হলে কোন লেখা কোন্ বিভাগে পাঠাবো?

ঃ সম্পাদকের নামে।

—গ্রাহক না হলেও লেখা প্রকাশ হবে কি?

ঃ তা যদি না হত, তবে 'গ্রাহক-গ্রাহিকার আসর'-ই সারা বইটা জুড়ে থাকত।

পরেশচন্দ্র দাস, উত্তর চন্দননগর

—রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাসের নাম কি?

ঃ 'চার অধ্যায়'।

—শব্দহেঁয়ালি ছাড়া গল্প, ছবি বা অন্য কিছু প্রতিযোগিতা কি কিশোর ভারতীতে থাকবে?

ঃ দেখই না অপেক্ষা করে।

কুমার চন্দন রায়, কুচবিহার

—রাশিয়া ও ইউরোপ কি ভিন্ন দুটি দেশ?

ইউরোপ মহাদেশের একাংশ নিয়ে রাশিয়া দেশ যা আবার এশিয়া মহাদেশ অবধি বিস্তৃত।

মিহির বড়াল, আসাম

—বিসমার্ক বলেছিলেন, তিনি যদি দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন তবে যেন মনুষ্যরূপে না আসেন। তিনি একটি পিপীলিকারূপে পৃথিবীতে আসতে চেয়েছিলেন। মানব-জীবন দুর্লভ, তবু তিনি কেন ঐরূপে আসতে চেয়েছিলেন?

ঃ হয়তো মানব-জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং পিপীলিকার জীবনযাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে। ঠিক কোন্ মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে তিনি ঐ উক্তি করেছিলেন, আমাদের পক্ষে তা অনুমানই করা চলে—নির্ণয় নয়।

—অভাবই আবিষ্কারের মূল। সত্য কি?

মূল হচ্ছে অনুসন্ধিৎসা—যার অভাব ঘটলে কোন আবিষ্কারই সম্ভব নয়। অবশ্য অনুসন্ধিৎসাও সাধারণতঃ আসে প্রয়োজন-বোধ থেকে। তাই ইংরেজীতে কথা আছে, necessity is the mother of invention.

শান্তনু ঘোষ, (স্থানের নাম উল্লেখ নেই)

—মহাকাশ জয়ে রাশিয়া না আমেরিকা, কে অগ্রগামী?

বিশেষ কোন জাতির দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে মহাকাশজয়কে সমগ্র মানবজাতির জয় হিসাবে দেখাই শ্রেয়ঃ নয় কি? দুটি রাষ্ট্রই আজ সমানে সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

—কমপিউটার যন্ত্রে যে সব আশ্চর্য বাণী শোনা গিয়েছিল, যা কিশোর ভারতীর পূজা সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে, সেগুলো কি সত্যি?

ঃ রচনা মনোগ্রাহী করার জন্য অনেক সময় তার সঙ্গে কল্পনার খাদ মেশাতে হয়। তবে কমপিউটারে যে সে সময় মাঝে মাঝে রহস্যজনক গোলমাল শোনা গিয়েছিল, তা সত্যি। তার কারণ নির্ণয় করা যায় নি।

—কিশোর ভারতীতে রূপকথা দেওয়ার অর্থ কি?

ঃ কেন? রূপকথা কি শুধু শিশুদের জন্যেই? ছেলেভুলোনো-ছড়া আর রূপকথা তো এক জিনিস নয়। বিশ্ব-

সাহিত্যের সেরা সব রূপকথার আসরে ছেলে-বুড়ো সবারই সমান ভিড়।

বিমল রায়, জামশেদপুর ৩

—টেলিভিশনে কি খালি ছবি দেখা যায়, না কথাও শোনা যায়?

ঃ শুধু দেখাই যায়। 'টেলিভিশন' কথার অর্থ দূরের জিনিস দেখা। যেমন কেউ গান গাইছে দেখা যায়, গানটা কিন্তু শোনা যায় না। ঐ সঙ্গে অবশ্য শোনার যন্ত্র বসালে শোনাও যায়। সেটা আলাদা ব্যবস্থা।

অশোককুমার রায়, মেদিনীপুর

—খেলাধুলার আসরে যদি পুরাতন রেকর্ড কিছু পাঠাই, তা হলে নেবেন তো?

ঃ অবশ্যই। পুরনো চাল যে ভাতে বাড়ে।

প্রতাপচন্দ্র বর্মন, জলপাইগুড়ি

—রবীন্দ্র পুরস্কার কি?

ঃ রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার। রবীন্দ্রনাথের স্মরণে এ পুরস্কার পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক দেওয়া হয়।

সৈয়দ আহসান জমিল, মুর্শিদাবাদ

—কার্ল্ মার্ক্স্ কে? তিনি কোন্ দেশের? মার্ক্স্-এর মতবাদ কি. তিনি কি করতে চেয়েছিলেন?

ঃ তোমার এই প্রশ্নের জবাব অল্প কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। কার্ল্ মার্ক্স্ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের তত্ত্ব, কর্মপন্থা ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভাবন করেন। শ্রেণীশোষণ-ভিত্তিক বর্তমান সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করে, তার উপর সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্রষ্টা হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর যে বিশ্বব্যাপী ভূমিকা রয়েছে, কার্ল্ মার্ক্স্ই প্রথম ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের সহযোগিতায় তা ব্যাখ্যা করেন। কার্ল্ মার্ক্সের এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, এঙ্গেল্সের সহযোগিতায় তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও ব্যাখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমাজবাদই মার্ক্স্বাদ বা মার্কসীয় মতবাদ নামে খ্যাত। এই মতবাদের দ্বারা চালিত হয়ে রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। তারপর আরো অনেক দেশে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে. শ্রেণী-শোষণ ও অসাম্যের অবসান ঘটিয়ে সেখানে স্থাপিত হয়েছে সমাজ-তন্ত্র। কার্ল্ মার্ক্স্ এটাই চেয়েছিলেন। আজও দুনিয়ার দেশে দেশে মার্ক্স্বাদ হচ্ছে বিক্ষুব্ধ শোষিত শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণের হাতে এক মহাশক্তিশালী অস্ত্র।

আশিসকুমার ভূঞা, চব্বিশ পরগনা

—কিশোর ভারতী সত্যিই এক সুন্দর লোভনীয় পত্রিকা। শরতের সোনাঝরা রোদ্দুরের মতই ঝকমকে। কি চমৎকার! আমি কিন্তু আজীবন কিশোর ভারতীর গ্রাহক হয়ে থাকব।

ঃ কিশোর ভারতীকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্বও কিন্তু তোমাদের—তোমরা যারা কিশোর ভারতীর গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা। তোমরাই পার কিশোর ভারতীর খবর ছড়িয়ে দিতে শহরে-বন্দরে গ্রামে-গঞ্জে দূর-দূরান্তরে। এর জন্যে চাই প্রচার। কিশোর ভারতীর সুদৃশ্য প্রচারপুস্তিকা শীঘ্রই পাঠানো হচ্ছে তোমাদের কাছে। বন্ধুবান্ধব পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন সকলের কাছে সেই প্রচারপুস্তিকা এমনভাবে ছড়িয়ে দাও যাতে বিচিত্র আনন্দে বোঝাই কিশোর ভারতীর সোনার তরী গিয়ে ভিড়তে পারে প্রতিটি বাঙালী কিশোর ও তরুণ মনের বন্দরে বন্দরে।

আজির উদ্দিন তপাদার, কাছাড়

—বর্তমানে কিংবা কিশোর ভারতী প্রকাশের পূর্ব হইতে আর কোন কিশোর পত্রিকা প্রকাশিত হয় কি?

ঃ বর্তমানে তো নয়ই, অতীতেও শুধু কিশোরদের জন্যে প্রকাশিত কোন পত্রিকার খবর আমাদের জানা নেই।

সোমপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ২০

—শব্দহেঁয়ালির দ্বিতীয় ছকে (শারদীয়া সংখ্যা) লিভিং-স্টোনকে দক্ষিণ মেরুর আবিষ্কর্তা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু লিভিংস্টোন আফ্রিকার কোন কোন অংশ নতুন করে আবিষ্কার করেন। আমুণ্ডসেনকেই প্রকৃত দক্ষিণ-মেরুর আবিষ্কাররূপে জানি। লিভিংস্টোন তাহলে কোথাকার দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেন।

ভুল স্বীকারে লজ্জা নেই। সত্যি খুব মারাত্মক একটা ভুল আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। এজন্য আমরা অনুতপ্ত।

শঙ্কর ঘোষ, বনগাইগাঁও

—আমার আঁকা কয়েকখানি কার্টুন ও হাসির কথা পাঠাতে চাই। আপনারা তা কি আপনাদের পত্রিকায় স্থান দিবেন?

ঃ সম্পাদক মনোনয়ন করলে প্রকাশে বাধা নেই।

সুচরিতা মিত্র, কলিকাতা ২৫

—কিশোর ভারতী সত্যিই আমাদের ও প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর একটি উপযুক্ত ও মনোমত পুস্তক। এত ভালো আর কোন বই আমার লাগেনি, এত আনন্দও আর কখনো পাইনি। যদি খেলোয়াড়দের এক একজনের বিষয় দেওয়া হয়, তবে আমি খুশী হবো। মাঝে মাঝে বড় বড় লোকদের সম্বন্ধে (যেমন বিদ্যাসাগরের বিষয় দেওয়া হয়েছিল) দেওয়া হলে আমার মনে হয় ভালো হয় এবং শিক্ষাও লাভ করা যায় সেই থেকে।

ঃ তোমার অভিমত সানন্দে শিরোধার্য।

শান্তনু তালুকদার, শ্রীরামপুর, গড়িয়া

—আচ্ছা, অনেকে যে বলেন মানুষ সারাদিন যা আলোচনা করে. ঘুমোবার আগে যা ভাবে, রাত্রে তাই স্বপ্ন দেখে—এটা কি সত্যি? কিন্তু যার কথা বা যে ঘটনা নিয়ে আমি এক-বারও আলোচনা করিনি, তাই স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্ন জিনিসটা কি, একটু বলুন না।

ঃ গত ১৩৭৫ সালের মাঘ সংখ্যার 'সওয়াল-জবাব' বিভাগে তোমার এ প্রশ্নের জবাব পাবে। সেখানে প্রশ্ন ছিল, 'মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে?'

—আচ্ছা, মেয়েদের নামের আগে 'শ্রী' লেখাটা কি ঠিক? বেশ কয়েক জায়গায় কিন্তু ওরকম দেখেছি। আপনি কি বলেন?

ঃ এটা রুচির প্রশ্ন—উচিত-অনুচিতের নয়।

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৬

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন

দেশ

দেশ পত্রিকা লিখেছেন ঃ "কিশোরদের জন্যে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির আয়ু মাত্র এক বৎসর, এরই মধ্যে শিশু সাহিত্যের আসরে সে প্রথম সারিতে স্থান করে নিতে পেরেছে। ......**বাংলার প্রায় শতাধিক সাহিত্যিকের সচিত্র রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ এই বিশেষ সংখ্যাটি কিশোরদের পূজার দিনগুলি আনন্দে ভরিয়ে রাখতে পারবে।**......"

যুগান্তর (সাময়িকী)

যুগান্তর (সাময়িকী) বলেন ঃ "কিশোরদের মন আর চাহিদা মেটাবার মতো অথচ বর্তমান বিজ্ঞান,, শিল্প আর সাহিত্যের ক্রম-অনুযায়ী তাদের মানসিক পরি-পুষ্টির সহায়ক পত্র-পত্রিকার অভাব এদেশে খুবই। এরই মাঝে 'কিশোর ভারতী' বর্ষকালের মধ্যেই এদিক থেকে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেকখানি যে সফল করতে পেরেছেন আর তাদের উদ্যম যে উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। বর্তমান শারদীয়া কিশোর ভারতী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ। **বাংলাদেশের প্রবীণ অনেক লেখকেরই লেখা এতে আছে। একথা বলা চলে যে, শুধু 'লেখার' জন্যই তাঁরা লেখেন নি, আমাদের কিশোরদের মনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা লিখেছেন।** . তার উপর সুন্দর কাগজে, চিত্তাকর্ষক ছবিতে সংখ্যা-খানি ভরপুর। যাঁদের ছবি আছে, তাঁরাও কুশলী ও কৃতী শিল্পী।......"

দৈনিক বসুমতী

দৈনিক বসুমতী-র সুচিন্তিত অভিমত ঃ "......ছোটদের উপযোগী যে কয়েক-খানি শারদসংকলন হাতে পেয়েছি তার মধ্যে **এই বৎসরের "শারদীয়া কিশোর ভারতী" অদ্বিতীয়। এই রকম একখানি শিশুমনোপযোগী সুন্দর শারদসংকলন যে কোন বাড়ীতে, লাইব্রেরীতে, স্কুলে রাখা প্রয়োজন। রুচিসম্পন্ন সম্পাদনা শিশুদের নিঃসন্দেহে আনন্দ দেবে।**......"

বিদ্যোদয়ের বই

ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি
সমরজিৎ কর

প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত একটি দ্বীপের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে 'স্কুইরেল' নামে একটি মালবাহী জাহাজের নাবিকরা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করার মতোই একদিন খোঁজ পেল ভয়ঙ্কর সেই মানুষটির, একমাত্র যার উদ্ভট মগজেই বুঝি জেড রশ্মি গজাতে পারে। ওকে অর্থাৎ পিয়ার্সনকে ধ্বংস করতে গিয়ে সকলের কি অবস্থা হয়েছিল বিজ্ঞানাশ্রয়ী ও অ্যাডভেঞ্চারধর্মী এই উপন্যাসটি তারই রুদ্ধশ্বাস কাহিনী॥ [**মূল্য : ৩·২৫**]

কঙ্কাবতী [২য় সংস্করণ]
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বহুর মধ্যে একটি অভিমত : "মৃদু মৃদু ব্যঙ্গ শ্লেষ এবং তিরস্কারের সঙ্গে উদ্দাম উদ্ভট এবং উধাও করা কল্পনা আর প্রচুর পরিমাণে কৌতুকরস মিশিয়ে ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে যে বিরাট দান রেখে গেছেন কঙ্কাবতী তারই একটি অংশ।..." [**যুগান্তর**]

[**মূল্য : ৩·৫০**]

অথ ভারত কথকতা [২য় সংস্করণ]
শ্রীকথকঠাকুর

বহুর মধ্যে দুটি অভিমত : "গ্রন্থের লেখক ছদ্মনামে অবতীর্ণ হলেও তিনি পাকা লেখক। লেখক কথকতার সুরে গল্প-রস পরিবেশন করেছেন...যার আকর্ষণ বহু আবৃত্তিতেও ম্লান হয় না। বইখানি মুখ্যত ছোটদের জন্য, কিন্তু বড়রাও পড়ে খুশি হবেন।" [**আনন্দবাজার পত্রিকা**]

"(লেখক) মূল গল্পটিকে রাখিয়া তাহাতে নূতন 'রক্ত-মাংস ও মজ্জা' যোজনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই কাজ তিনি নিপুণ শিল্পীর ন্যায় সমাধা করিয়াছেন। দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করিতে হয় যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই বই পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবে।" [**দেশ**] [**মূল্য ৩·০০**]

সুশীল জানার

গল্পময় ভারত প্রথম খণ্ড — গল্পময় ভারত দ্বিতীয় খণ্ড

বহুর মধ্যে একটি অভিমত : "...ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে যে অতুলনীয় কাহিনীসম্পদ রহিয়াছে, বলিতে গেলে তাহাই মন্থন করিয়া শ্রীজানা এই গল্পগুলি সংকলন করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে শুরু করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য উপনিষদ, জাতক, ধম্মপদ, জৈনকথা, মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, বাসবদত্তা, হর্ষচরিত, মালতীমাধব, মুদ্রারাক্ষস, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, মৈমনসিংহগীতিকা প্রভৃতি ২২ খানি গ্রন্থ হইতে ২৮ টি গল্প তিনি চয়ন করিয়াছেন। এই অতুলনীয় গল্পসম্পদ যে ভাষায় পরিবেশিত হইয়াছে, তাহার সহিত রূপকথা বলার ভঙ্গী মিশান থাকায় গল্পগুলি পরম উপভোগ্য হইয়াছে।...গল্পগুলি দেশের ছেলেমেয়েদের প্রাচীন যুগের মানুষদের সত্য-প্রীতি, দেশাত্মবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক আচার-আচরণের সঙ্গে পরিচিত করিবে। 'গল্পময় ভারত'কে আমরা বাংলা শিশু-সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া অভিনন্দন করিতে পারি।" [**যুগান্তর**] [**মূল্য : প্রতি খণ্ড ৩·০০**]

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯ * ফোন : ৩৪-৩১৫৭